শীত আসে উৎসবকে গায়ে জড়িয়ে। অনেক উৎসবের মাঝে বিয়ের উৎসব শীতের এক বড় অলঙ্কার। আমাদের অলঙ্কার সে অর্থে নয়। তাহলেও কনের গায়ে অলঙ্কারতো চাই। আমরা তারই নির্মাতা।

P 34,209

এ, টি, জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন কুমার কর্মকার।

ফুলিয়া রেলবাজার. বেলেমাঠ, নদীয়া

[মাছ বাজারের সন্নিকট]

ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গয়নার কথা ভাবলেই **এ, টি, জুয়েলার্সের** কথা ভাবেন।

প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে।

› হাজার টাকা পর্যন্ত জমা সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত

ায়করদাতাদের জন্য নতুন উপহার

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প

স্ত হেড পোষ্ট অফিসে এবং কিছু সংখ্যক সাব পোষ্ট অফিসে এই প্রকল্পের অধীনে পাশ বই খোলা যাচ্ছে।

ই প্রকল্পে বছরে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমান আর সর্বাধিক আয়কর ছাড়ের সুযোগ নিন।

তীয় সঞ্চয় প্রকল্পে জমা সমস্ত টাকা আয়কর আইনের ৮০ সি সি এ ধারা অনুযায়ী করযোগ্য আয় থেকে বাদ যাবে। এই সুযোগ
সি ধারা অনুযায়ী যে ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায় তার অতিরিক্ত

একজনের নামে কেবলমাত্র ১০০ টাকা দিয়ে একটি পাশবই খোলা যায়। প্রতিমাসে ১০০ টাকার গুণিতক হুবায় পর্যন্ত
কা জমা দেওয়া যাবে এবং একটি আর্থিক বছরে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমান যাবে। জমা টাকার ওপর চক্রবৃদ্ধি
রে ১১% সুদ।

বছরে একবার টাকা তোলা যাবে। একজন আমানতকারী যে আর্থিক বছরে টাকা তুলতে চাইবেন তার চার বছর আগের র্থিক বছরের শেষ দিনে যে টাকা জমা ছিল তার থেকে ইতিমধ্যে যদি কোন টাকা তোলা হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে বাকী সবটাই নি তুলে নিতে পারবেন। যে জমার ওপর কর ছাড়ের সুযোগ নেওয়া হয়েছে সেই অর্থ যে বছর তোলা হবে সেই বছরে সুদ সমেত যোগ্য আয় বলে গণ্য করা হবে।

যে আর্থিক বছরে শেষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তা শেষ হবার তিন বছর পর যে কোনদিন প্রকল্প বন্ধ করা যাবে। অবশ্য মানতকারীর মৃত্যুর পর যে কোনদিন প্রকল্প বন্ধ করা যাবে।

এজেন্টের মাধ্যমে পাশবই খোলার সুবিধা আছে।

রও জানতে হলে আজই খোঁজ নিন বি. ডি. ও অফিস, সহ অধিকর্তা, জেলায় স্বল্প সঞ্চয় অধিকার রাইটার্স বিল্ডিংসে।

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মিক সংখ্যা ১৯ । ৮৯-৯০ আই.এ.ও.সি এ । নদীয়া তাং ২০ ১০-৮৯

এখন শীতের মরসুম। শীতের মরসুম মানেই বিয়ে মরসুম। বিয়ের মরসুমে কনেকে সাজাতে চাই মন পছন্দ শাড়ী। বাজারে শাড়ীর অভাব নেই। তা হলেও বলি টাঙ্গাইল্ রেশমের জুড়ি নেই। বেনারসী টাঙ্গাইলে কনেকে বিয়ের পিড়িতে বসানোর সৌন্দর্যই আলাদা।

বেনারসী টাঙ্গাইলে কনেকে সাজাতে হলে সরাসরি চলে আসুন টাঙ্গাইলের ভিটে ফুলিয়াতে। বাসেই আসুন আর ট্রেনেই আসুন আমাদের শোরুম খুঁজে পাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। বাস স্ট্যাণ্ডের গায়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননীগোপাল দাস।

চটকাতলা, ফুলিয়া।

ফোন : ফুলিয়া ৩৮/৩৯

●

কলকাতা বিক্রয়কেন্দ্র

বালিগঞ্জ, কলিকাতা ১৯

ফোন- -৮৫৮৭

প্রাণী-সম্পদ বিকাশ সমাচার

গরুকে সবুজ ঘাস খাওয়ান
দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করুন—

রবি মরসুমে চাষযোগ্য সবুজ ঘাসের বীজ বা কাটিং সরবরাহ শুরু হয়েছে। সেচযুক্ত বা অসেচযুক্ত জমিতেও সবুজ ঘাসের চাষ করা যায়।

সেচ সেবিত ১০ কাঠা জমিতে উৎপাদিত সবুজ ঘাস একটি গরুকে সারা বছর সবুজ ঘাস যোগায় এবং সেক্ষেত্রে দুধের উৎপাদন খরচ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। কারণ, সে সব ক্ষেত্রে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন প্রায় তিন চতুর্থাংশ কমে যায়।

আপনার এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে ঘাস চাষের জন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র বা 'মিনিকিট' হিসাবে বিভিন্ন মরসুমী সবুজ ঘাসের বীজ দেওয়া হয়ে থাকে। অবিলম্বে নিকটবর্তী পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সাথে যোগাযোগ করে রবি মরসুমে ঘাস চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করুন।

মনে রাখবেন, দুধের উৎপাদন খরচ কমাতে এবং গরু-মহিষের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে সবুজ ঘাসের জুড়ি নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ২৪/৮৯/৯০ আই,এণ্ড,সি,এ, নং তাং ১৪-১১-৮৯

আবেদন

বেশ কিছুদিন ধরে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বনের পশু-পাখী ও তাদের চামড়া, শিং, দাঁত এবং অন্যান্য অংশ াদির অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। আজকাল প্রায়ই গ্রামে দেখা যাচ্ছে যে অবৈধভাবে ব্যাঙ ধরা ও মারা হচ্ছে এবং সেগুলি না জায়গায় বিক্রি হচ্ছে। ফলে মশার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে, সেই সাথে লোকালয়ে সাপের উপদ্রবও বাড়ছে কারণ ব্যাঙই পের প্রধান খাদ্য।

বর্তমান পরিবেশ যে হারে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যেই এই বসুন্ধরা মানুষের বাসের পক্ষে অযোগ্য হয়ে বে। বন ও বনের পশুপাখী বিভিন্নভাবে এই ভয়াবহ পরিবেশ দূষনের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। বন্যপ্রাণী রক্ষণ) ১৯৭২ আইনানুসারে বনের পশু-পাখী বা তাদের চামড়া, শিং, দাঁত ও অন্যান্য অংশ ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে [redacted] নিলে [redacted] যদি কেউ এ [redacted] আইন [redacted] বন তা [redacted] তার জেল ও জরিমানা হ[redacted]

বনের পশুপাখী দুষ্কৃতকারী ও অবৈধ ব্যবসায়ীর হাত থেকে রক্ষা করা শুধুমাত্র আইন ও সরকারী প্রশাসনের কতিপয় কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। এদের রক্ষা করতে হলে চাই আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা। আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন যেখানেই এই অবৈধ কার্যকলাপ দেখবেন সেখানেই আপনারা সমবেত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। নির্মল পরিবেশ রক্ষা করতে ও মানুষের সুস্থ সবল জীবনধারণের স্বার্থে, বনের পশুপাখীকে প্রকৃতির কোলে অবাধে বিচরণ করতে দিন।

বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ১০ । ৮৯-৯০ আই.এণ্ড.সি. এ । নদীয়া তা ৩.১১.৮৯

ইত্যা সৈকত অক্টো-ডিসে' ৮৯

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অন্যথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি :-

আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার কম।

অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য প্রশংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে। 'লোক আদালতের' তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ২৩। ৮৯-৯০ আই. এণ্ড. সি. এ।

নদীয়া, তাং ১৪/১২/৮৯

একগুচ্ছ কবিতা

আগামী দিনের প্রতিজ্ঞা আমার

শরীরের উত্তাপ আর ভালবাসা দিয়ে
পৃথিবীর কাজ করবো আমি বিশেষ কিছু কাজ।
সকালের প্রথম সূর্যের কাছে
এই প্রতিজ্ঞা আমার প্রতিদিনের।
সময় আর আর শূণ্যতা বাড়ে ধীরে ধীরে
মামুলি কাজের ভারে দিন অবনত।
আমার প্রতিজ্ঞা যায় ভেসে
একান্ত গণ্ডির মাঝে অকারণ চলা
নিঃশব্দ দিনটা শুধু
ভার হয়ে নেমে আসে দু'চোখে আমার,
অশান্তির দামামা শুনি
কান পেতে বুকে।
দিন শেষে রাত্রি আসে নির্দিষ্ট নিয়মে,
আমারও উপায় নেই থমকে দাঁড়ানোর,
বুক থেকে খসে যায় দিনটা আমার
কঠিন শপথ নিয়ে ঘুম আসে চোখে,
আগামী দিনটা যেন,
উসলিয়ে নিতে পারি কড়ায় গণ্ডায়।

যুক্তি তর্ক সারাবেলা

কথার পিঠে কথা রেখে
একলা ঘরে থমকে দাঁড়াই
উত্তর নেই, কেইবা দেবে !
নিজেই আমি ছন্দ সাজাই।
প্রশ্নের বাণ তীক্ষ্ণ করে
বেঁধাই বুকে একে একে
'রোশো একটু থামো,
আমার পালা এখন থেকে'।
আমি ও আমার সত্তা মিলে
নীরব ঘরে জমাই খেলা
হার জিতের এই কঠিন পালায়
যুক্তি তর্ক সারাবেলা।

মনটা আমার পালিয়ে বেড়ায়

চার দেওয়ালের মধ্যিখানে
সকাল-দুপুর রাত্রি আসে
ভালবাসার কাব্য শোনায়
সঙ্গোপনে ভালবাসে।
আমার নেশা চোখের তারায়
উদাস হয়ে বিশ্ব ঘোরে,
পাখীর শিসে উন্মনা মন
প্রজাপতির পাখায় ওড়ে।
হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে
ভাবনা আমার ভেসে বেড়ায়,
নদীর চরে পথ হারিয়ে,
নীল ঢেউয়ে পানসি ভাসায়।
এই মনটা লুকিয়ে পালায়
বনে বনে সবুজ পাতায়,
ভোরের বেলা শিশির হয়ে
মুক্তো ঝরে ঘাসের ডগায়।

তুমি বিংশ শতকের মেয়ে

সৃষ্টির অমোঘ নির্দেশ মেনে,
তুমি আজো হাঁটো দৃষ্টি নত করে,
বিংশ শতকের মেয়ে তুমি ;
শুধু নারী বলে-
এই পৃথিবীতে তোমার জন্মগত পরিচয়।
নির্দিষ্ট গণ্ডিতে তুমি আজো বাঁধা আছো,
টপকাতে পারো না আজো নিষেধের বেড়া।
এই পৃথিবীর ভালো-মন্দ তাই
সবই বাঁধা তোমারি কপালে।
বিশ্ব ঘোরে দ্রুত লয়ে
তবু তুমি থাকো একই পথে বসে
তোমার চলার পথ পঙ্কিল পিচ্ছিল
জন্মতেই অপমান তুমি নারী বলে।
ধারালো ছুরির ঘায়ে
ফালা ফালা হয়ে যায় তোমার সম্মান
তোমার স্বাধীন সত্তা বন্দী আজো
অন্ধকার দেওয়ালের মাঝে
তাই তুমি চিরদিনই হও ক্রীতদাসী।

বাহারি নৈনীতাল

নৈনীতালের বক্ষজুড়ে
নৈনী লেকের বাস,
জল ছল ছল নৌকা বিহার
রঙ বাহার উচ্ছ্বাস।
শ্যাওলা সবুজ আঁচলে তার
গুজরিয়া ফুল বিজলী ছড়ায়;
ভোরের শিশির চমক হেনে
প্রাণটা ভরায় মনকে মাতায়।
সবুজ জলের সবুজ ছায়ায়
নীল-আকাশী মেঘ ভেসে যায়
কী অপরূপ এমন বাহার
সবার আগে মন কেড়েছে কার!

নির্জনে একাকী তুমি শোন নদী

ধূ-ধূ প্রান্তর কুশবনে ভরা বুক
শোন নদী, গভীর ক্ষতের মত
ইতিহাস নিয়ে বুকে
নিরালা প্রান্তরে তুমি
একা বসে আছো।
বিছানো বালির স্রোত
বিস্তর-বিস্তীর্ণ-নির্জন অসীম,
যেন পলক পড়ে না চোখে
চেয়ে চেয়ে কেটে যায়
কত শত বছরের ঢেউ।
পরদে পরদে তোমার
কত গাথা ইতিহাস ;
বালির অন্তে মেশা
সে রক্তের স্রোত।
কান পেতে শোনো নাকি
হাহাকার দীর্ঘশ্বাস
দীর্ণ প্রতিধ্বনি !
বুকের পাঁজরে তোমার
কত শত অশ্বের খুর
ক্ষত হয়ে আছে আজও
প্রাণের গভীরে।
ঢেকে দিতে সেই স্মৃতি
প্রলেপন দিয়েছো কি
অজস্র বালুকার রাশি !!

কৌশানী তুমি সত্যিই সুন্দরী

পাইন ছাওয়া পাহাড় গায়ে
কোশী নদী ডাইনে-বাঁয়ে
চলছে নেচে তিরতিরিয়ে
কৌশানী তুমি অপূর্ব সুন্দরী।
ভোরের বেলা নবীন সূর্য
তোমায় দিল প্রথম অর্ঘ্য
সোনার আলোয় আর এক স্বর্গ
তোমার বুকে কৌশানী সুন্দরী।
পাহাড় কাটা ধাপে ধাপে
স্বর্গ সিঁড়ি তোমার বুকে
কে রেখেছে এমন এঁকে
পাহাড় রানী কৌশানী সুন্দরী!
রং বাহারি ফুলের ঝারি
পাহাড়ি মেয়ে সারি সারি
লাল সবুজে জমেছে ভারি
কৌশানী তুমি সত্যিই সুন্দরী।

পাহাড়ী মেয়ে রানীক্ষেত

ক্ষেতের পরে ক্ষেত সাজিয়ে
পাহাড় বুকে থরে থরে
রানী তোমার বসতবাটী
সাজিয়েছো সুন্দর।
এক নজরে দুচোখ ভ'রে
পাইন বনে এলাম ঘুরে
বাদামী র- পাহাড় চূড়া
রৌদ্রে মনোহর।
পাহাড় ঘেরা সবুজ ঝালর
সবুজ ঘাঘরা সবুজ চাদর
লাল গোলাপের কাঁচুলি গায়
তুমি সেজেছো সুন্দর।
মন যে বলে হারিয়ে যেতে
তোমার বুকে-পাইন ক্ষেতে
এই ঠিকানাহীন পথ চলাটাই
হোকনা সুমন্থর।

এক আঁজলা সুখের খোঁজে

নিসঙ্গ নিরালা রাত—
সমস্ত দুঃখই নেয় আমাতে আশ্রয়
ভাবনার প্লাবন আনে নিস্তরঙ্গ ব্যথা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাই গভীর প্রত্যয়।
দুঃখের কবর খুঁড়ে
সুখের আশ্রয় খোঁজা
হলেও বা নিছক বিলাস।
সামনে দুচোখ রেখে
অবিশ্রাম পথ হাঁটি ব্যস্ততার সুখে।
দুর্গম বন্ধুর পথে একদিন খসে যাবে,
পিঠে বেঁধা দুঃখের বান।
এক আঁজলা সুখের খোঁজে
যদি থেমে পড়ি কোন এক
মরুদ্যান সায়রের তীরে ;
সেই সত্য জীবনের
নিঃশেষে মুছে দেবে গ্লানি
একমাত্র অপার্থিব নিশ্চিন্ত সে সুখ

কেটে গেছে কতদিন

কেটে গেল কতদিন তিল তিল করে,
পরিবর্তন বাইরে ঘরে
মনের অন্দরে।
দেহের আনাচে কানাচে কোটে
অনাদরে ঘাসফুল
নির্দিষ্ট নিয়মে।
ব্যস্ত ব্যস্ত কাজে
সারাদিন ভোর;
স্মৃতিও ফেরে না ভুলে
অলস প্রহর গুণে
একা একা চেনা পথে,
এক দুই তিন

উনিশশ' উননব্বই

মাধব ভট্টাচার্য

আর ক'টা দিন বাদেই উনিশশ' উননব্বই পৃথিবীর মাটি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। ৩১শে ডিসেম্বরের রাতে মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখনই সে চুপিচুপি পৃথিবীর মাটিতে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে চলে যাবে। মাঝরাতে গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজবে, জাহাজের ভোঁ শোনা যাবে কোথাও কোথাও, কোথাও বা শাঁখ বাজবে। এতে করে কারো ঘুম হয়তো ভাঙ্গবে, কারো হয়তো ভাঙ্গবেনা। উননব্বই চলে গেলে নতুন সূর্য উঠবে নতুন আকাশে—উনিশশ' নব্বই-এর আকাশে। পৃথিবীর মাটিতে উনিশশ' নব্বইকে স্বাগত জানিয়ে উননব্বই মুখ লুকোবে।

একটু পেছন ফিরে তাকালে উনিশশ' উননব্বইয়ের কত স্মৃতিই না ভেসে উঠবে চোখের সমুখে। সুখ দুঃখের কত দিনলিপি। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪৭০ কোটি মানুষের জীবনের ছোট বড় কত ঘটনারইতো নীরব সাক্ষী হয়ে রইল সে।

আজকের দিনে মানুষের জীবনে রাজনীতির প্রভাব যতটা অন্য কোন কিছুই বোধকরি ততটা নয়। রাজনীতির উত্থান-পতনই আজকের দুনিয়ার সেরা ঘটনা। বিশ্বজুড়ে সে চিত্রই চোখে ভাসে।

বছরটা শুরু হয়েছিল শান্তির বাণী শুনিয়ে। রুশ নেতা মিখাইল গর্বাচভ বলেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে শান্তি উপহার দেবেন উনিশশ' উননব্বইতে। আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশও শপথ নিয়েই দুনিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। উননব্বইয়ের জন্ম-লগ্নের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো চুক্তিপত্রে

সই করেছিলেন—না, আমরা কেউই পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাবোনা। পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটেনি ঠিকই। সব দেশের খবরতো সঠিক জানা নেই, তবে রাশিয়া ১৬টি পরমাণুকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও আরো ১৫টি কেন্দ্র গড়বে এরকম খবর পাওয়া গেছে। ভারতের আকাশে অগ্নি উড়েছিল ঠিকই সে নিতান্তই পরীক্ষামূলকভাবে। কিন্তু শান্তি! বছরতো ঘুরে গেল, শান্তি কি এলো!

উনিশশ' উননব্বইতে পৃথিবীর মানুষ কতটা শান্তি আর সোয়াস্তিতে কাটিয়েছে বলতে পারবোনা, তবে অশান্তি বোধকরি গর্বাচভের নিজের দেশকেও ছাড়েনি। ধর্ম নিয়ে অশান্তি, শ্রমিক অসন্তোষ এসবতো লেগেই ছিল। সোভিয়েত রাশিয়াতে শ্রমিকরা ধর্মঘটের অধিকার অর্জন করে নিলো এই ক'দিন আগে।

সুদীর্ঘ ৩০ বছর বাদে পৃথিবীর দুই শক্তিধর দেশ রুশ-চীন বৈঠকে মিলিত হলো। গর্বাচভ এলেন চীনে। তং শিয়াং ফিং তাঁর হাত ধরে করমর্দন করলেন। বৈঠক করে সহাস্যে ফিরে গিয়ে চীন সীমান্ত থেকে দু'লাখ রুশ সৈনা সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিলেন গর্বাচভ।

কিন্তু চীন! সে তার ভেতরের আগুন দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ধিকি ধিকি করে দীর্ঘদিন ধরে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল চীনের নতুন প্রজন্মের মধ্যে তা' ছড়িয়ে পড়লো গোটা দেশটার দেহে। গত মে মাসের শেষ দিকে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র ছাত্রী তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে জড়ো হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী লি পেংয়ের ইস্তফার দাবীতে। ফৌজি গুলিতে ৫০০০ ছাত্রের মৃত্যু হলো। মরলো, তবে তিয়েন স্কোয়ার রাঙিয়ে দিয়ে গেল ওদের রক্তে। কি চেয়েছিল চীনের এই তরুণের দল? স্বদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা বৈ ত কিছু নয়।

এইতো ক'দিন আগে ফিলিপিনসে সামরিক অভ্যুত্থান

ঘটতে যাচ্ছিলো। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন প্রেসিডেন্ট কোরাজোন আকিনো। আকাশ থেকে বোমা পড়ছিল শ্রীমতী আকিনোর প্রাসাদ লক্ষ্য করে। সাইত্রিশ বছর পর আর্জেন্টিনায় ক্ষমতা বদল হল। প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিলেন কার্লোস মেনেম। চিলিতে নির্ব্বাচন হল কুড়ি বছর পর এই ডিসেম্বরে। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের নামইতো হয়ে গেল "হরতাল দেশ"। গত জানুয়ারী মাসের ২১ দিনের মধ্যে রুমনিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটলো। ৩০ দিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়েছে। আর নিজেদের দেশ। সে কথায়পরে আসছে।

গোটা বছর জুড়েইতো শ্রীলঙ্কা অশান্ত হয়ে রইল রাজনৈতিক খুন জখম হয়েছে যথেষ্ট। তবে দেশটার গর্ব্ব করার মতন একটা বিষয় আছে তা হল এশিয়ার মধ্যে শিক্ষিতের হার ওদের দেশেই বেশি। শতকরা ৮৬ জন। আর আমাদের দেশে শিক্ষার হিসেবটা এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মুখ দিয়েই শোনাই—'পৃথিবীর সব থেকে বেশি সংখ্যক অশিক্ষিতের দেশ হিসেবে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা পা রাখবো'।

পরিবর্তন জাপানেও হয়েছে। না, রাজতন্ত্রের নয়। সম্রাট হিরোহিতো একটানা ৬২ বছর রাজত্ব করে গত জানুয়ারীতে মারা গেলে সিংহাসনে বসলেন তাঁরই পুত্র আকিহিতো। সম্রাটের কর মুক্ত মাইনের বহরটা শুনুন। এক-বছরের মাইনে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ইয়েন। টাকার অঙ্কে যা গিয়ে দাঁড়াবে ৩ কোটির কাছাকাছি। আকিহিতোর বাবাও এই টাকাই পেতেন। P 36,209

হিরোহিতো বোধ করি তাঁর মৃত্যুর ইঙ্গিতটা আগে থেকেই পাচ্ছিলেন। তাই মরার চার মাস আগে থাকতেই তৈরী হচ্ছিল তাঁর সমাধি। সেই সৌধ নির্মাণে নাকি খরচ পড়েছে ২৬৪ কোটি ইয়েন।

টাকা পয়সার কথা যখন উঠলই তখন আরও দু'একজনের

কথা বলি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পান বছরে ২লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আর সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান গর্বাচভ মাস গেলে পেয়ে থাকেন ১৫০০ রুবল অর্থাৎ ৩৮,০০০ টাকা। মন্ত্রীত্ব হারিয়ে রেগন পেশা হিসাবে এখন বেছে নিয়েছেন বক্তৃতা দেওয়া। তাঁর একটা বক্তৃতার ফিস হল ৪০,০০০ ডলার।

রাশিচক্র মতে জাপান ফেলে আসা এ বছরটাকে সাপবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সাপের মাংস খেলে নাকি মানুষের আয়ু বাড়ে। ওদের দেশে প্রায় ১ কোটি লোক সাপের মাংস খায়।

আমাদের দেশে অবশ্যি এক রাজনৈতিক নেতা 'উনিশশ' উননব্বইকে সংঘর্ষের বছর হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন বছরের শুরুতেই। কথাটা বোধ হয় খুব একটা বেঠিক হয়নি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উনিশশ' উননব্বই এক ঐতিহাসিক বছর হিসাবে স্মরণীয় হবে সন্দেহ নেই। নবম লোকসভা নির্বাচন তার সাক্ষ্য বহন করবে। কেন্দ্রে গঠিত হয়েছে জাতীয় মোর্চা সরকার। এখন কর্ণধার বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ নতুন মন্ত্রী মণ্ডলীর হাতে শুধু ভারতের ৯০ কোটি মানুষের ভাগ্যই নয়, ভারতবর্ষ নামক দেশটার সার্বভৌমত্বের ভাগ্যও বেঁধে দিয়ে উননব্বই বিদায় নিল।

উননব্বুইয়ের দিনলিপিতে এদেশে এমন একটি রাজ্য নেই যেখানে ছোট বড় কোন রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটেনি। সংঘর্ষ হয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, আসাম, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, দিল্লী, ত্রিপুরা, কলকাতা ও আরও কত জায়গায়। আবদুর ডাকা ৫ দিনের আসাম বনধে গুলি, আগুন, বোমা সবই দেখেছে আসামবাসীরা। দার্জিলিংয়ে খুন হল, দু'শ বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল বছরের প্রথম দিনেই। কলকাতার বেলেঘাটা, হাওড়া, সল্টলেক, কৃষ্ণনগর, অশোকনগর বা বহরমপুরের প্রত্যক্ষদর্শীতো অনেকেই রয়েছেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। পশ্চিমবঙ্গে ঝাড়খণ্ড, কাশ্মীরে জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের আন্দোলন। এই তো ক'দিন আগে উগ্রপন্থীদের জেল মুক্তির দাবীতে কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডাক্তার কন্যা অপহৃত হলেন। ৫ উগ্রপন্থীকে মুক্তির বিনিময়ে মেয়েকে ফিরিয়ে পেলেন মুফতি মহম্মদ সঈদ। কিন্তু কাশ্মীর উত্তাল হয়েছে বহু উগ্রপন্থীর কার্যকলাপে।

দিল্লীর তিহার জেলে সতবন্ত-কেহরের ফাঁসি হয়ে গেল এবারে সত্যি সত্যি। ফাঁসির খবর আরও আছে। পাঞ্জাবের এক গ্রামে উগ্রপন্থীরা একই বাড়ির ৪ ভাইকে একসঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলালো। তেহরান ও ইরানের ২৫টি শহরে একদিনেই ৭০ জনের ফাঁসি হয়েছে। ফাঁসির ইতিহাসে এটা বোধ হয় রেকর্ড করলো। এই ৭০ জনের পরিচয়-এরা সবাই ড্রাগ পাচারকারী। মরা মানুষের ফাঁসিও রদ হতে দেখা গেছে মৃত্যুর ৩১ বছর বাদে হাঙেরীতে।

রাজনীতি যেমনি মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে ধর্মও কম যায় না। ফেব্রুয়ারীতে মৌনী অমাবস্যায় দেড় কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রয়াগের জলে স্নান করলেন। হরিগীতা রামায়ন প্রচার সমিতির উদ্যোগে মাথায় রামায়ণ নিয়ে বিগ্রেড থেকে বড়বাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলেন প্রায় ৮০ হাজার নারী পুরুষ। নেপালে তো আন্তর্জাতিক রামায়ণ সম্মেলনই হয়ে গেল বিশ্বের ১৭টি দেশের ১৫০ জন পণ্ডিতের প্রতিনিধিত্বে। তবে এ বছর ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির লড়াই বেঁধেছে রামশিলাকে কেন্দ্র করে। অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস হলো। ৪০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কলকাতা ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পারিষদের উদ্যোগে রামশিলা যজ্ঞও হলো। ধর্মের প্রভাব এমন বহু রুশবাসীদের মধ্যেও। কলকাতার এসপ্লানেডে লেনিনের মূর্তির সামনে ১০০ রুশ কৃষ্ণ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করতে

করতে বিভোর হয়ে পড়লেন। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আট বছর ধরে মৌন হয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাগপুরের সাধু বালযোগী বাবা মোহনদাস উদাসীন। এভাবে তিনি ১৪ বছর থাকতে চান।

প্রকৃতির রোষ নেমে এসেছে এখানে ওখানে। অষ্টআশির মত উনন্নব্বই ও রাশিয়ার মাটিতে ভূ-কম্পনের সাক্ষী হয়ে রইলো। ৪০ সেকেণ্ডের কম্পনে তাজিকিস্থান তছনছ হয়ে গেল। ঝড়ে বাংলাদেশে মরলো হাজারের ওপর। এদেশের ওপর দিয়েও ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেছে। কয়লা খনিতে জল ঢুকে শ্রমিক মরেছে। গাড়ী বেলাইন হয়েছে কতবারই কত স্থানে। সমুদ্রের উর্দ্ধসীমা যে হারে বাড়তে শুরু করেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে নাকি গোটা বাংলা দেশটাই সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে এরকম শোনা যাচ্ছে।

এত বড় বিশ্বে ঘটনার কি শেষ আছে? মৃতের ফাঁসি রদ হওয়াই শুধু নয়, চিতার আগুন থেকে মৃত ব্যক্তি উঠে এসে কথা বলেছেন। শতায়ু এই বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছেনা তবে নিবাস রাজকোটের কাছে মালাক্কা গ্রামে।

জমির দুঃশ্চিন্তায় যাদের ঘুম নেই তাদের দুশ্চিন্তা কাটল বলে। জমির আকাল আর থাকছে না। আমেরিকার এক নভশ্চর শ্যানন লিউসিড জানিয়েছেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমেরিকানরা মহাকাশে বসবাস করবে। রুশ বিজ্ঞানী রোয়াল্ড সাগ দেইয়েভেরও একই মত। তবে চাঁদের চেয়ে মঙ্গলের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। তাঁর মতে এই শতাব্দীর মধ্যেই মঙ্গলে বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে।

উদ্যমী যুবকদের জন্য কাজের সন্ধান আছে। তবে তাদের গিয়ে থাকতে হবে জিম্বাবোয়ের মুসিন্দো গ্রামে। ভোর হতে না হতেই মাঠে মাঠে চাষের কাজে নেমে পড়ে মুসিন্দো গ্রামের মেয়েরা। শুধু চাষ নয়, ছেলেদের সব কাজ করে মেয়েরাই।

উল্লেখ্য ঐ গ্রামে একটিও পুরুষ নেই। শেষ পুরুষটি গত বছর মারা গেছেন। ভয় নেই, জিম্বাবোয়ের গড় আয়ু ভাল। বর্তমান প্রবীণতম মানুষটির বয়স ১২১। এখনও সু স্বাস্থ্যের অধিকারী। নাম জেমস তিরিওয়াশোমা মাইগুরিয়া। তাঁর সংসারের পরিধি-বউ ৪ জন, ছেলে মেয়ে ৩৫ আর নাতি-নাতনি ৯০। ইন্দোরের কাছে উপজাতি প্রধান খুরদি গ্রামের বৈশিষ্ট্য হলো স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো নাম মুখে আনেনা।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি বিয়ে হয়েছে এমন দম্পতিদের নিয়ে টেক্সাসে এক সমীক্ষক দল সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে মাত্র ১/৩ অংশ সুখী দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। বাদ বাকী হয় ভেঙ্গে গেছে নয়তো আধভাঙ্গা। সে তুলনায় অভাব-অভিযোগ যাই থাক না কেন ভারতীয়দের দাম্পত্য সুখ বেশি।

মনীশকে এখন অনেকেই তো চেনেন। গত মার্চে প্রেমিকা মধুবালাকে বিয়ে করলো সে। প্রেমের মর্যাদা রাখতে গিয়েই না দিল্লীর এক হাসপাতালে লিঙ্গ অস্ত্রোপচার করলো সে।

প্রেম-পরিণয়ের আরো কত খবরই না উননব্বইয়ের বুক লেপটে রয়েছে। বিয়ের পিড়িতে বসেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো কনে। বিয়ের বাসরেই সন্তানের জন্ম হলো। উপস্থিত সকলের চোখ ছানাবড়া। কটকের জগৎ সিংপুর গ্রামের গোড়া সমাজ মেনে নিল কেননা বর-কনের অনেক দিনের মেলামেশার খবরটা তারা জানতো। তবে ব্যতিক্রম কি নেই! আছে। পণের ১৮ হাজার টাকার মধ্যে ৭ হাজার টাকা বাকী ছিল। দিতে না পারায় বিয়ের দু'মাসের মধ্যে আমতা গ্রামের পান্নালাল হাজরা তার বউকেই দিল বিক্রি করে।

পামেলার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। সুন্দরী পামেলা তো ক'দিনের জন্যে দেশে বিদেশে ঝড় তুলে দিয়ে গেল।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতের' ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় এলে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার' নিজ

হাতে তুলে দিলেন সত্যজিৎ রায়ের হাতে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহান্তি এসে সত্যজিৎ রায়কে আসামের সরকারী পুরস্কার শঙ্করদেব ব'টা দিয়ে সম্মানিত করে গেলেন। দেশে বিদেশে সম্মানিত হয়েছেন আরও অনেকেই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডি.লিট পেলেন লীলা মজুমদার। আলি আকবর সম্মানিত হলেন পদ্ম বিভূষণে। বাবার আমতে, পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থকে বিশ্বভারতী দিল দেশিকোত্তম। মানবাধিকার পুরস্কার পেলেন ম্যাণ্ডেলা। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন দলাইলামা। অমর্ত্য সেন পেলেন ২ লক্ষ ডলার মূল্যের আন্তর্জাতিক গিয়ভানি অ্যাগনেলি পুরস্কার। শীর্ষেন্দু পেলেন আকাদেমী। ফরাসী বিপ্লবের দু'শ বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেল প্যারিসে। কলকাতা এবার ৩০০ বছর পূর্ণ করলো। কেমন আছে ওর শরীর? খুব ভাল নেই। বছর ভর লাঠি, গ্যাস, বোমা, গুলি এ সবের ধকল ওকে সইতেই হয়েছে তারপর এবারে কলকাতা সহ রাজ্যের আরও অনেক জেলাতেই এইডস্ এর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ওষুধের সঙ্গে। বেশ ক'জন অন্তসত্ত্বা মহিলার শরীরে ঢুকে গেছে এই বিষ। স্টোনম্যান নামক আগন্তুকের ভয়ে কলকাতার ফুটপাতবাসীরা দিশেহারা হয়ে পড়লো কিছুদিন। সেই সঙ্গে পাগলা কুকুরের দাঁতের কামড়। কলকাতা পুরসভার সমীক্ষা অনুযায়ী এ বছর কলকাতায় কুকুরের কামড়ে মরেছে ৩৪১ জন। তবে সুখবর একটা আছে। কলকাতার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ফুটপাতবাসীর জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে নৈশাবাস তৈরী করে দিচ্ছে সি, এম, ডি, এ। মধ্যবিত্তদের জন্যেও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা আছে সল্টলেকে।

বাড়ির কথা যখন উঠলো তখন বলি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ি তৈরী হচ্ছে জাপানের টোকিও শহরে। ৫০০ তলার এই

বাড়িটি তৈরীতে খরচ হবে ৩৩ হাজার কোটি ডলার। তাজমহলের অনুকরণে "দা ট্রাম্প তাজ" তৈরী করছেন আমেরিকার এক ডুঁদে ধনী নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে। তাঁর মতে ১৭ একর জমির ওপর ৪২ তলা এই বাড়িটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো। আর আমাদের দেশে ২৭'১০ কোটি মানুষের বাস দারিদ্র্য সীমার নীচে।

দামী খবর আর একটা শোনাই। দূরদর্শনে মহাভারতের অনুষ্ঠানই হচ্ছে সবচেয়ে দামী। মহাভারত চলার আগে ১০ সেকেণ্ডের বিজ্ঞাপনের খরচ ১ লক্ষ টাকা। মহাভারতের প্রতিটি পর্ব থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ আয় ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

দুঃখদৈন্যতার মাঝেও বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কলকাতাবাসীকে উপহার দিয়েছে বিখ্যাত সব শিল্পীদের কণ্ঠের গান। নন্দনে দেখানো হলো গণশত্রু। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিউজিক কণ্ডাকটর জুবিন মেহতা ও পণ্ডিত রবিশঙ্করের ঐতিহাসিক যুগলবন্দী। সুকন্যা রাজনের সঙ্গে রবিশঙ্করের বিয়ের খবরটা এতদিনে কোন শিল্পানুরাগীরই অজানা থাকার কথা নয়।

খেলার মাঠের খবর তো অনেক। বছরের শুরুতে সুপার সকার হল কলকাতার মাঠে। ১৭ বছর পর বাংলা উঠলো রনজি ট্রফি ফাইনালে। পৃথিবীর ৪০টি দেশ দিল্লীর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অংশ নিল অ্যাথলিটিকসে। চীনের কপালে জুটেছে ৪৩টি পদক। তার মধ্যে ২২টিই সোনা। ভারতের জুটেছে ৭টি সোনা সহ মোট ২২টি পদক। এ বছরের সবচেয়ে উত্তেজনা পূর্ণ খেলা বোধ হয় কলকাতার মাঠে পাকিস্তান-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একদিনের ক্রিকেট।

খবরতো আরও রয়েছে। কপিলদেব খেলার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়েও নামছেন। ফুটবলার মারাদোনা ঝুঁকেছেন

রাজনীতিতে। পরিচালক চন্দ্র শর্মা তো পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বেনজিরকে নিয়েই একটা ছবি করছেন। তবে কবে যে মুক্তি পাচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না। খবর আছে বেনজির দ্বিতীয় বারের জন্যে মা হতে যাচ্ছেন শীগগিরই। প্রধান মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার সম্ভবত মা নসরৎ ভুট্টোর হাতেই দিয়ে যাবেন।

উনিশশ' উননব্বই যাবার আগে পৃথিবী থেকে অনেককেই নিয়ে গেল। চলে গেলেন পৃথিবীর সেরা অভিনেতা লরেন্স অলিভার। আমাদের কাছের মানুষ মঞ্জু দে, তৃপ্তি মিত্র, বীরু মুখোপাধ্যায়। চলে গেলেন প্রিয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, প্রভাত ভূষণ। চলে গেলেন মুকুল দে, বাহাদুর হোসেন খান। চলে গেলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী। চলে গেলেন ভরত মহারাজও। চলে গেলেন আরও কত শত।

উনিশশ' উননব্বই এদের চলে যাওয়া দেখেছে। দেখেছে বহু নতুনের জন্ম। উননব্বইয়ের বুক লেপটে রয়েছে আরও কত ঘটনা, কত সুখ দুঃখের গল্পগাথা। সকলের সব কিছু তার দিনলিপির খাতায় লিখে রেখে সে নিজেই চলে যাচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে।

আবেদন

প্রতি বছরের মতো এবছরেও ৭ই ডিসেম্বর প্রাক্তন সৈনিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ এবং বর্তমানে কর্মরত সৈনিকদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে নদীয়া জেলার সর্ব্বত্র পতাকা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। পতাকা দিবসকে স্মরণীয় করতে মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসুন।

সচিব,
জেলা সৈনিক বোর্ড
কৃষ্ণনগর নদীয়া।

।। টুকরো খবর ।।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পেনসনারস এসোসিয়েশন ফুলিয়া শাখার বিজয়া-সম্মেলন

গত ২০শে অক্টোবর ৮৯ ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্রের সভা কক্ষে সমিতির সদস্যগণ শুভ বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেন।

এই অনুষ্ঠানে পেনসনারস এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅধীর কুমার মিত্র, ফুলিয়া উপনগরীর প্রশাসক ও স্থানীয় উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীরনজিত কুমার দাস, স্থানীয় এস, বি, আই-র ম্যানেজার শ্রী এস, এন, ঘোষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় শাখার সভাপতি শ্রী পরিমল চক্রবর্ত্তী। কুমারী শ্রীপর্ণা কুণ্ডুর কণ্ঠ ও শ্রী রাজা কুণ্ডুর তবলা লহরীতে উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্য, স্থানীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীগণেশ রায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সমিতির সদস্য, সদস্যাদের শুভবিজয়ার শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা জানিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু করেন এবং বিজয়ার উদ্দেশ্যও তার সার্থকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এরপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন অতিথি শ্রীঅধীর কুমার মিত্র, প্রধান অতিথি শ্রী রনজিত কুমার দাস, শ্রী এস, এন, ঘোষ, শ্রীহিমাংশু ঘোষ প্রমুখ। বৃদ্ধদের কথা ভেবে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ হন।

সভান্তে স্থানীয় সুগায়িকা শ্রীদেবী ভট্টাচার্য্য সমাপ্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ফুলিয়ায় শারদমেলা

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জনরঞ্জন কেন্দ্রের উদ্যোগে শারদমেলা অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় জনরঞ্জন কেন্দ্রের সম্মুখীস্থ মাঠে। ফুলিয়া এবং আশপাশ অঞ্চলের ৪০টি প্রতিমা এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। বেশ কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। উল্লেখ্য, এই উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজনও করেন উদ্যোক্তারা। ১৯৫৮ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান একনাগাড়ে হয়ে আসছে।

নবম লোকসভা নির্ব্বাচন - ১৯৮৯

মোট আসন সংখ্যা—৫৪২

নির্ব্বাচন হয়েছে ৫২৫টি আসনে।

ফলাফল—

কংগ্রেস (আই)	১৯৩
জনতা	১৪১
বি, জে, পি	৮৬
সি, পি, আই (এম)	৩২
সি, পি, আই	১২
এ, আই, এ, ডি, এম, কে	১১
আকালি (মান)	৬
শিবসেনা	৪
আর, এস, পি	৪
ন্যাশনাল কনফারেন্স	৩
ফা: বং	৩
তেলেগু দেশম	২
কংগ্রেস (এস)	১
ইউ, সি, পি, আই	১
হিন্দু মহাসভা	১
আই, পি, এফ	১
নির্দ্দল ও অন্যান্য	২৪

পশ্চিমবঙ্গের মোট আসন সংখ্যা ৪২.

ভোট হয়েছে মোট ৪১টি কেন্দ্রে

ভোটারের সংখ্যা— ৩, ৯৩, ৯৪, ২৭১ (৪১টি কেন্দ্রে)

প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৩, ১৪, ৬৬, ৩৮৩

বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩, ০৯, ৪৪, ৮৫০

বাতিল ভোটের সংখ্যা ৫২১, ৫৩৩

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা—

সি, পি, আই (এম)	১, ১৬, ৮১, ৩০৭	(মোট প্রার্থী ৩০)
সি. পি, আই	১২, ৩৩, ৭৪৫	(,, ৩)
ফঃ বঃ	১২, ৪৯, ৯০২	(,, ৩)
আর, এস, পি	১৪, ৮৫, ৮৯৭	(,, ৪)
বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সর্ব্বমোট ভোট	১, ৫৬, ৫০, ৮৫১	(,, ৪০)
কংগ্রেস (আ)	১, ১৮, ৯৪, ৮৫৯	
জনতা	১, ৬৭, ৮৫৪	
বি, জে, পি	৫, ২৯, ৬১৮	

পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল (আসন সংখ্যা ৪২ নির্ব্বাচন হয়েছে ৪১টিতে

সি, পি, আই, (এম	২৬
কংগ্রেস	৪
আর, এস, পি	৮
সি, পি, আই	৩
এ, আই, এফ. বি	৩
নির্দ্দল ও অন্যান্য	১

নদীয়া জেলার ফলাফল—

নদীয়া জেলার দু'টি কেন্দ্র (১) নবদ্বীপ (২) কৃষ্ণনগর

ভোটার সংখ্যা ১০, ৭৩৬০৭ নবদ্বীপ

৯, ২১৪৬৮ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ : নির্বাচিত অসীমবালা সি, পি, এম) প্রাপ্ত ভোট
৪, ৬৯০৬২

কৃষ্ণনগর : ,, অজয় মুখোপাধ্যায় ,,) ৩, ৪৫৩৫৯ ,,

আপনি জানেন কি ?

● প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে কচ্ছপের গুরুত্ব অপরিসীম পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র ইত্যাদি জলরাশির জৈবিক আবর্জনা, গলিত শব ইত্যাদি ভক্ষণ করে কচ্ছপ জল পরিশোধিত করে।

● ক্রমাগত শিকারের ফলে এই প্রাণীটি আজ বিলুপ্তির পথে। এই কারণে কচ্ছপ কেনা বেচা, ধরা, রাখা ও মারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ১৯৭২ আইনানুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

● প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মল রাখতে এদের রক্ষা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ২২-৮৯-৯০ আই, এণ্ড,সি, এ নদীয়া তাং ১৯-১২-৮৯

সম্পাদকীয়

গত ২২ ও ২৪ নভেম্বর '৮৯ ভারতে নবম লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচন বিগত ৮টি লোকসভা নির্বাচন থেকে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি অর্থে—(এক) এবারকার নির্বাচনে আঠার বছর বয়সীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন (দুই) শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন দেখতে চেয়েছে জনতা। এর থেকে যা ভাববার তা হল নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা এবং পবিত্র অধিকারের দোহাই দিয়ে দুপুর রোদ্দুরে লাইনে দাঁড়িয়ে বহুদিন ধরে বহুবার যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এলেন তাদের মানসিকতা।

ভারতে লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা ৫৪২টি। এর মধ্যে নির্বাচন হয়েছে ৫২৫টি আসনে। নির্বাচন হয়নি আসাম রাজ্যে। এছাড়া গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪টি আসনে। রাজ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্তর প্রদেশেই লোকসভার আসন সংখ্যা সব থেকে বেশি। মোট ৮৫টি। এই ৫২৫টি আসনে নির্বাচনের ফলাফল এতদিনে কারো অজানা নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আসন সংখ্যা ৪২। এর মধ্যে ৪১টি কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন হয়নি দুর্গাপুর কেন্দ্রে। ৪১টি কেন্দ্রে বিভিন্ন দলের মোট ৩২৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি ভোট পেয়ে জিতেছেন দমদম কেন্দ্রের নির্মলকান্তি চ্যাটার্জী। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৫, ৫৬, ১৩৯টি। আর সবথেকে কম ভোট পেয়ে হেরেছেন শ্যামপুকুর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সিদ্ধেশ্বর সমাদ্দার। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৫৯।

রাষ্ট্রপতির ডাক পেয়ে জনতাদল কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনে এগিয়ে এলেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর নেতৃত্বে ও প্রধান মন্ত্রীত্বে মন্ত্রীসভা গঠনও প্রাথমিকভাবে শেষ। নবগঠিত এই মন্ত্রীসভার কাছে গোটা ভারতের মানুষের এখন শুধু প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণে সার্থক হলেই সরকার প্রকৃত অর্থে জনতার সরকার হয়ে উঠবে।

SAHITYA SAIKAT
Oct Dec' 89 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R N I

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন

আমাদের এই গর্ব আমাদের শিল্পীদের জন্যেই। দক্ষ শিল্পীর হাতে বোনা নিত্য নতুন ডিজাইনের টাঙ্গাইল শাড়ীর দেশ বিদেশের চাহিদা মেটাই আমরাই।

আপনিও আসুন আমাদের—

" সমবায় সদন " এ

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প
সমবায় সমিতি লিঃ

●

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
ফুলিয়া, নদীয়া।
দূরভাষ—ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়।
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষ ১ □ সংখ্যা ২ □ জানু-মার্চ ১৯৯০

এ সংখ্যার সূচী

ধূলিয়া	: নারায়ণ সান্যাল	৭
মানুষ এস, কে, দে	: ইলা মজুমদার	৯
রামায়ণ রচয়িত্রী চন্দ্রাবতী দেবী	: কাকলি ভট্টাচার্য	১৭
নতুন বই (পুস্তক সমালোচনা)		২১
টুকরো খবর		২৩

বিদ্যুৎ চুরি মেনে নেবেন ?

এই যে হঠাৎ কারেন্ট গেল
ঝুপ করে হায় নামলো আঁধার
রাখেন কি খোঁজ চুরির ভারে
পুড়লো দামী ট্রান্সফরমার ?
কারখানাতে বন্ধ মেশিন
চাষের ক্ষেতেও উঠছে না জল,
পড়াশোনায় চরম ক্ষতি
হাসপাতালে যন্ত্র বিকল
চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন
পড়শী কারেন্ট করছে চুরি
হুক আর ট্যাপের জ্বালায়
দেশের ক্ষতি ভুরি ভুরি।
বিজলি গ্রাহক ভুগবে কেন
রাস্তায়, ঘরে, কলে ক্ষেতে ?
আসুন চোরের হাত বেঁধে দিই
বাঁচি আলোয় আনন্দেতে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

[কর্পোরেট জনসংযোগ কর্তৃক প্রচারিত]

ভারত এক এবং অখণ্ড

ভারত এক এবং অখণ্ড

সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেশের
জনসাধারণ দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেদের
রায় ঘোষণা করেছেন। জনগণের
ইচ্ছাই শেষ কথা।

কিন্তু দেশের আনাচে কানাচে মাথা
চাড়া দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদপন্থা
আর বিচ্ছিন্নতার কালো ছায়া।

আমরা কি দেশকে টুকরো টুকরো হতে দেব?
ভারত এক এবং অখণ্ড—এই উপলব্ধিই
আমাদের পথ দেখাক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা 2718৮-90 I & C. A. Nadia তাং 6-2-90

আপনার জমা টাকা ৫½ বছরে দ্বিগুণ করুন

কিষাণ বিকাশ পত্র

৫০০, ১০০০, ৫০০০ ও ১০,০০০ টাকা মূল্যমানের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

২½ বছর পরে টাকা তোলার সুবিধা।

পরিচয় পত্র ও নমিনেশনের সুবিধা।

সমস্ত ডাকঘরে পাওয়া যায়।

নীচের ঠিকানায় আরও জানতে পারবেন :—

কোলকাতায়	জেলায়
নিকটস্থ ডাকঘর	নিকটস্থ ডাকঘর
স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিংস	বি, ডি, ও অফিস
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা,	সহ অধিকর্তা, স্বল্প সঞ্চয়।
নিজাম প্যালেস।	

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মি ÷ সংখ্যা ২৫ ৮৯-৯০ আই. এণ্ড. সি. এ। নদীয়া তাং ৯-১২-৮৯

সংসদ প্রকাশিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থামলা

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

- রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ৪০.০০
- বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫.০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

- ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৩৭.৫০

ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

- তে হি নো দিবসা ৪০.০০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত

- তন্ত্রের কথা ১০.০০
- উপনিষদের কথা ১০.০০

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

- ঠাকুরবাড়ির কথা ২৫.০০
- উপনিষদের দর্শন ২০.০০

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত

- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ২৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী রচিত

- রাজনীতি ১৫.০০

বৈদ্যনাথ ঘোষ রচিত

- কল্পান্ত ২০.০০

অমিতা চক্রবর্তী রচিত

- সংস্কৃত নাটকের গল্প ১০.০০

ডঃ শঙ্কর ঘোষ রচিত

- স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ২০.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

NADIA ZILLA PARISHAD PRESS

KRISHNAGAR, NADIA.

EQUIPPED WITH 6 MODERN PRINTING MACHINES,
CUTTING, NUMBERING, PERFORATING,
STITCHING AND RULLING MACHINES.

BINDING SECTION SEPARATE

QUALITY PRINTER OF ALL GOVT. AND
SEMI GOVT. MATERIALS.

মানুষের গতিশীল জীবন তো উত্থান পতনেরই পথ চলা। সেই পথ চলার সময়ের আবর্তে অনেক কিছুই ম্লান হয়ে যায় জীবন থেকে। কিন্তু সংসারে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যার ক্ষয় নেই যা কোন দিন অনুজ্জ্বল হয় না। যা শুধু সুখের দিনে প্রিয়জনকে উপহারই নয় দুঃসময়ের বন্ধুও।

আমরা আপনাকে সেই উপহারই দেবো। —*খাঁটি সোনার গহনা*

এ টি জুয়েলার্স আপনার সুদিন ও দুর্দিনের বন্ধু।

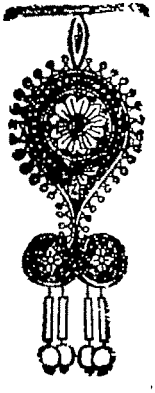

এ.টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ—শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া।

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গয়নার কথা ভাবলেই *এ টি জুয়েলার্স*-র কথা ভাবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে

BUILD YOUR OWN HOUSE AT LOW COST
WITH THE ADVICE OF EXPERIENCED
CIVIL ENGINEER.

M. MAZUMDER
Consulting Civil Engineer.
FULIA, NADIA.
Ph :- 46.5240 (Cal)

ফুলিয়া

নারায়ণ সান্যাল

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

কেউ বলেন গৌড়েশ্বর নন, বাস্তবে তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ. কেউ বলেন রাজা গণেশ। মোট কথা, স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক তিনি শুনিয়েছিলেন সেই রাজার দরবারে। কাকতালীয় ঘটনা যদি বল তবে তাই সই। জন্ম: ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী পূজার দিনে। মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমীতে। পিতার নাম বনমালী ওঝা, মায়ের নাম মালিনী দেবী। 'ওঝা' নবাবী খেতাব। আসলে ওরা মুখুটি ব্রাহ্মণ। গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ করে কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হওয়ার মনোবাসনা সমেত রওনা দিলেন গৌড়েশ্বরের সভায়। সৌভাগ্য আমার — চাকরীর প্রথম পর্যায়ে ফুলিয়াতে বদলী হয়েছিলাম। বারে বারে ঐ স্মৃতিস্তম্ভটির সামনে নত মস্তকে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি। পাশেই 'কৃত্তিবাস কূপ' অনতিদূরে কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়। এ সব তো মানুষের কীর্তি। প্রকৃতিও ঐ সঙ্গে যোগ করল তার শ্রদ্ধার্ঘ। একটি অতি বিশাল বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অভ্রভেদী মহিমায় দণ্ডায়মান। যেন প্রকৃতি রোঁয়া কৃত্তিবাস বালজাকের মূর্তি গড়েছেন।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অনতিদূরে যবন হরিদাসের গোম্ফা। মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে 'হরিদাস' নামের কিছু বাড়াবাড়ি। 'বড় হরিদাস' 'ছোট হরিদাস' তার উপর আবার এই 'যবন হরিদাস'। এঁর আদি নাম ব্রহ্ম ঠাকুর। হরির ভক্ত ছিলেন বলে নাম হয় 'হরিদাস'। কেউ বলেন ইনি

মুসলমান পিতার সন্তান, আবার কেউ বলেন তা নয়— আসলে বাল্যকালে তিনি এক সহৃদয় মুসলমানের গৃহে পালিত হয়েছিলেন। এঁর অসাধারণ হরিভক্তির কথা শুনে কাজী ক্ষেপে যান। মুসলমান হয়ে একি! দিবারাত্র হরি-বোল হরিবোল!

গ্রেপ্তার হলেন যবন হরিদাস। মুসলমান ফৌজদার আর কাজী মিলে ফতোয়া জারী করলেন ওদের এলাকার বাইশটি হাটে। বন্দীকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর হাটে বাজারে লোক যখন জমজমাট তখন বন্দীকে বেত্রাঘাত করা হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনও মুসলমান এ জাতীয় পাপ কাজ না করে।

যবন হরিদাস বাইবেল পড়েছেন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রতিবার তিনি বাইবেল থেকে নির্ভুল উদ্ধৃতি শুনিয়ে গেলেন: প্রভু! এরা জানে না, এরা কি অন্যায় করছে। তুমি ওদের ক্ষমা করো। হরিবোল হরিবোল!

অবশ্য তথ্যটা আমরা পাই ছন্দবদ্ধ পদ্যে:—

'এসব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ॥

বাইশ বাজারে যখন হরিদাসকে দণ্ড ভোগ করতে হয়নি, এটাই রক্ষে। দু'চার হাট পার করেই কোতোয়াল এসে জানিয়ে গেল শাস্তিদানের কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। কাজী আর সুবেদারকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বলছে— জোড়া পাষণ্ড আর হরিদাস হয়ে উঠছেন সবার প্রণম্য! শহীদ! অবতার!

বন্ধ হল অত্যাচার। বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। ফিরে এলেন নিজের গোফায়। প্রতিষ্ঠা করলেন ছোট এক সারি বিগ্রহ—বলরাম, রেবতী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। অপূর্ব।

---

০ লেখকের রূপমঞ্জরী উপন্যাসের অংশ বিশেষ।
সৌজন্য : কলকাতা পত্রিকা

শ্রীমতী ইলা মজুমদারের চিঠি ও লেখা

Munich
11. 10. 89

শ্রদ্ধেয় মাধববাবু,

প্রথমে আপনাকে ৺বিজয়ায় আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। ৺এস, কে, দে, সম্বন্ধে লেখাটা পাঠালাম। লেখাটা ছাপা হোলে আমাকে মিউনিকের এই ঠিকানায় একটা কপি অনুগ্রহ কোরে পাঠিয়ে দেবেন।

পশ্চিম জার্ম্মানীর সাংস্কৃতিক দিক এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান ও ঘটনাবলী নিয়ে লিখি এবং আরও লেখার আছে। 'বর্ত্তমান' কাগজে আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। আপনি কি ধরণের লেখা সম্বন্ধে আগ্রহী এবং কত শব্দের মধ্যে — তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

৺এস, কে, দে সম্পর্কিত লেখাটা একবারই পাঠাতে দেরি কোরে ফেললাম— কারণ আমি মাঝখানে ব্রোঙ্কাইটিস হোয়ে অসুস্থ হোয়ে পড়ি। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা কোরবেন। অধিক কি?

ইতি—

ইলা মজুমদার

পুনঃ প্রতিবছর মে মাস নাগাদ দেশে যাই ১৯৯০তেও যাবো। যাবার দিন ঠিক হোয়ে গেলে আপনাকে জানাবো।

ইলা মজুমদার

পত্রলেখিকা শ্রীমতী মজুমদার প্রয়াত প্রশান্ত মজুমদারের স্ত্রী। প্রশান্ত মজুমদার (আই, এ, এস) যখন ফুলিয়া উপনগরী গড়ে উঠছিল কর্মসূত্রে এস, কে, দে'র (ফুলিয়ার রূপকার সম্প্রতি প্রয়াত) সহযোগী ছিলেন। গত বছর মে মাসে দিল্লীতে এস, কে, দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে স্মরণ করে 'সাহিত্য সৈকত' এর গত জুলাই-সেপ্টেম্বর' ৮৯ সংখ্যায় এস, কে, দে'র লেখা ও কয়েকটি চিঠি ছেপেছিলাম। তখনই আমরা শ্রীমতী মজুমদারকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম ফুলিয়া এবং এস, কে, সমপর্কে স্মৃতিচারণ করার জন্যে।

শ্রীমতী মজুমদার বিলম্বে হলেও আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন। বর্তমানে তাঁর বাস পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক-এ। মানুষ এস, কে, দে শিরোনামে তাঁর লেখাটি দেরীতে আমার হাতে পৌঁছানোয় নির্দিষ্ট সংখ্যায় কাজে লাগাতে পারিনি। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এস কে, দে যে কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন শ্রীমতী মজুমদারের ছোট এই লেখাটি পড়ে বোঝা যায়। সঃ সাঃ সৈঃ

মানুষ এস. কে. দে

ইলা মজুমদার

সন ১৯৭৮। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউটের একটি কেবিন। আমার স্বামী স্বর্গতঃ পি, এস, মজুমদার শেষ শয্যায় শায়িত। ওষুধ কিনতে বাইরে বেরিয়েছিলাম। একটু বাদে ফিরে এসে দেখি এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। মাঝে মাঝে আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। কত লোকইত তখন আসতেন ওঁকে দেখতে। সবার নামও জানতাম না। কিন্তু এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হোল উনি যেন শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই ওঁকে দেখতে আসেননি। সত্যিকারের একটা বেদনাবোধ ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। বোধ করি সেই কারণে আমিও খুব সহজভাবে মন খুলে ওঁর সঙ্গে কথা বোলছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ আমার স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই দেখি উনি ইসারা কোরে আমায় ডাকছেন। কাছে যেতেই বোললেন —"ইনিই সেই এস, কে, দে যিনি কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেন্টের মিনিষ্টার ছিলেন নেহেরু ক্যাবিনেটে এবং পরে কিছুদিন ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি সচেতন হোয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল—এই সেই এস, কে, দে যাঁর কথা আমি সারাজীবন আমার স্বামীর কাছে শুনেছি—বিশেষ করে আমার বিবাহের পর ১৯৫১-৫২ সনে। ইনিই তিনি যিনি আমার স্বামীর কর্মময় জীবন যেন পরশ পাথর ছুঁইয়ে উৎসাহ উদ্দীপনায় স্বর্ণোজ্জ্বল কোরে তুলেছিলেন। দেশভাগের পর যে কর্মময় জীবন নিযুক্ত ছিল দেশ গড়ার কাজে।

১৯৫১ সন। সবে আমার বিবাহের পর ফুলিয়াতে গিয়েছি। বাংলায় ফুলিয়া—পাঞ্জাবে নীলখেরি এই দুইটি জায়গায় মডেল টাউনশিপ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিয়েছেন এস, কে, দে। তাঁর পদটির নাম ছিল—এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর। পার্টিশনের রক্তরাঙা দুইটি প্রদেশের উদ্বাস্তুদের নিয়ে পুণর্বাসন করার কাজ ছিল তাঁর। সেইজন্যই বাংলায় ফুলিয়া আর পাঞ্জাবে নীলখেরিতে — মডেল টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি।

ফুলিয়াতে যাবার আগেই শুনেছিলাম সেখানে সব শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা থাকেন ছোট ছোট টিনের বাড়ীতে। এই -ই তাদের সরকারী কোয়ার্টার্স। আর এস, কে, দে? একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলাম এগ্রিকালচার ফার্মের এক প্রান্তে— —যেখান থেকে সুরু হোয়েছে 'সবুজ পল্লী'— তারই কাছাকাছি এক জায়গায়। এস, কে, দের কোয়ার্টার্স ছিল সেখানে। পৌঁছে দেখলাম একখানি ছোট মাটির ঘর। সামনে খোলা দাওয়া। বাখারির জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম —সেখানে একজন মানুষের শোবার মত একটি চৌকি। এক-খানি তোষক পাতা বিছানা তাতে। খদ্দরের সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা সেই বিছানা। আর যতদূর মনে পড়ছে বোধ হয় ছোট একটি লেখার টেবিল এবং একটি কাঠের চেয়ারও ছিল সেই ঘরটির এক পাশে। এখনও মনে আছে ঘরটি দেখেই আমার স্বামীকে বোলেছিলাম— "এই ঘর দেখেই বোঝা যায় কোন স্তরের মানুষ তিনি"। সবচেয়ে বড় কথা- সর্ব্বহারা উদ্বাস্তুদের সাহায্য কোরতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন— তাঁদের সঙ্গে তাঁদেরই সমভূমিতে নেমে এসে— চেষ্টা কোরেছিলেন তাঁদের মত কোরেই থাকতে। শুধু নিজেই নয়— যাঁরা তাঁর সঙ্গে এই বৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞে যোগদান কোরেছিলেন— তাঁদেরও সেই আদর্শে

উদ্বুদ্ধ কোরতে সমর্থ হোয়েছিলেন তিনি। তাই আমরাও থাকতাম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে— উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরী দুই কামরার ছোট টিনের বাড়ীতে।

এটা ১৯৫১-৫২ সনের কথা।

তারপর জীবনের অনেকগুলি দিন— অনেকগুলি বছর পেরিয়ে উপস্থিত হোলাম ১৯৭৮ সনে। এস, কে, দে মন্ত্রীত্ব থেকে তার অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। আমার স্বামীর সঙ্গে মাঝে মধ্যেই তাঁর যোগাযোগ হোত। ওর কর্মজীবনের খবরাখবর সবসময়ে রাখতেন তিনি। সেইরকমই খবর নিতে এক মধ্যদিনে তিনি উপস্থিত হ'ন দিল্লির আসাম হাউসে। সেখানে গিয়ে শুনতে পান আমার স্বামী দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হোয়ে শেষ শয্যায় শায়িত। তখনই তিনি ছুটে যান অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়ান্সে— তাঁকে দেখতে। আমার সঙ্গে পরিচয় হ'বার পর বোলে উঠলেন— "কত বয়সে ছোট ও আমার থেকে। এখনই ওর যাবার ডাক পড়ে গেল।"

১৯৭৯ সন। আমার স্বামী চলে গেলেন জানুয়ারীর প্রথমে। এস,কে, দে, ছুটে এলেন আসাম হাউসে। স্বান্তনা দেবার চেষ্টা কোরলেন— ভগ্ন বিপর্য্যস্ত আমাকে। আর চেষ্টা কোরলেন তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ দিয়ে আমার ছেলে মেয়েদের কাছে টেনে নিতে।

কয়েকমাস পরের কথা দিল্লি ছেড়ে কোলকাতায় চলে আসবো। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা এস, কে, দে, আসাম হাউসে এসে উপস্থিত। বোললেন— "চল-তোমার মাসিমাকে নিয়ে এসেছি। তিনি তোমায় দেখতে চান। আগেই শুনেছিলাম— এস,কে,দের স্ত্রী—মাসিমা প্যারালিসিস্ হোয়ে

বিছানায় শয্যাশায়ী। ভীষণ অবাক হোয়ে গেলাম। ভাবলাম— কি করে ঐ শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এলেন— আমার মত একজন অখ্যাত, শোক বিপর্য্যস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য? আমার প্রশ্নের উত্তরে বোললেন "একটি ড্রাইভার যোগাড় করেছি। কোন-রকমে তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে এসেছি। তিনিও যে তোমার সঙ্গে দেখা কোরতে চান। দেখলাম যোগ্য মানুষের যোগ্যা স্ত্রী তিনি। আমাকে গাড়ীর ভেতর কাছে টেনে নিয়ে— ঠিক স্নেহময়ী মায়ের মত— তত যে আশ্বাসবাণী শোনালেন তার সবটা আজ মনে নেই। কিন্তু তার প্রভাব আমার ভেতর কতখানি কার্য্যকরী হোয়েছিল আজ পিছন ফিরে সেই দুর্যোগের দিনগুলির দিকে তাকালে বুঝতে পারি।

কোলকাতায় চলে এলাম। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে নিয়মিত যোগযোগ রয়েছে এস. কে, দের সঙ্গে। হঠাৎ একদিন ওঁর একটা **Post Card** পেলাম। লিখেছেন উনি কোলকাতায় এসেছেন —রাজভবনে আছেন রাজ-অতিথি হোয়ে। পোষ্ট কার্ডে ওঁর ফোন নম্বর দিয়ে লিখেছিলেন—চিঠিখানা পেয়েই যেন ও'র সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। তাই কোরলাম। বোল্‌লেন—"তুমি নীপাকে (আমার ছোট মেয়ে) নিয়ে চলে এস। ঘরে ঢুকতেই হৈ হৈ করে বলে উঠলেন—"আরে এস এস"। আমি জিজ্ঞেস্ কোরলাম—"হঠাৎ আপনি এ সময়ে কোলকাতায়"? উনি এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কোরলেন—"তুমি আমার **Statesman** এর লেখাটা পড়েছ"? কয়েকদিন আগে **Statesman** কাগজে এস, কে, দের একটা লেখা বেরিয়েছিলো। খুব ইন্টারেষ্ট নিয়ে

লেখাটা পড়েছিলাম। লেখাটার মধ্য দিয়ে উনি ওঁর দুইটি মানস সন্তান—ফুলিয়া ও নীলখেরির মধ্যে—বর্তমান বাস্তব অবস্থা নিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা কোরেছিলেন। যেটা আমায় সবচেয়ে বিস্মিত কোরেছিল এই লেখাটার মধ্যে —তা হোল - উনি একেবারে নির্ভয়ে সূর্যের আলোকের মত সত্য সমালোচনা কোরেছিলেন ফুলিয়ার তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে। —বিশেষ করে নীলখেরির সঙ্গে তুলনা করে। বোললাম —"হ্যাঁ পড়েছি"। উনি বোললেন—এর পরই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ওঁকে আমন্ত্রণ জানান—এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে এবং সেই সব জেলার উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে। তারই জন্য ওঁর এখনকার আসা। ওঁর সফর শেষ হোয়েছে এবং রিপোর্টও লেখা হোয়ে গিয়েছে। তা আমায় দেখালেনও। কিন্তু এইসব কথাবার্ত্তার মধ্যে সবচেয়ে যা আমায় আকৃষ্ট কোরেছি —তা হোল—একটি অসাধারণ ঘটনা। সফর কোরতে কোরতে এস, কে. দে যখন মেদিনীপুরে পৌছালেন —তখন উনি হঠাৎ সাংঘাতিক ভাবে এক পেটের অসুখে আক্রান্ত হোয়ে পড়েন। যাকে বলে—গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস (Gastro-entritis) —সেই গোছের। কোলকাতা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সব ছুটে গেলেন। ওঁকে কোলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসা করাবার জন্য সবাই প্রস্তাব দিলেন সেই সময় ওঁর বয়স আটাত্তর বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু উনি বেঁকে বোসলেন। ওঁর একই কথা হোল —"যদি মেদিনীপুরের অগতি জনতা—এখানকার এই চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে চলতে পারে—তা'হলে আমিই বা তা কেন পারবো না? আমার এই চিকিৎসার জন্য আমি কিছুতেই কোলকাতায় যাব না" ----------

—এ ই-ই ছিলেন প্রয়াত এস, কে, দে। জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক স্তরে দাঁড় করিয়ে জনকল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করা ছিল—তাঁর জীবনের ব্রত। সেই ব্রত হয়ত অনেকেরই থাকে। কিন্তু তার পিছনে যে মানবিকতার দরকার তা ৺এস, কে, দের মধ্যে যে কতখানি গভীরভাবে ছিল —তা আমার নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি কোরেছি। তাই যখন ওঁর প্রয়াণের খবর জানলাম —তখন শুধুই মনে হয়েছে নেতা নয় —মন্ত্রী নয়—আমার এক অত্যন্ত নিকট আত্মীয় চলে গেলেন।

—০—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের

পুতুল নাচ উৎসব '৯০

১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

স্থান : শিবানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান, স্বরূপগঞ্জ।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দশটি ও অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, বিহার ও উড়িষ্যার পাঁচটি পুতুলনাচের দলের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান তৎসহ বিশাল প্রদর্শনী।

।। সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার ।।

ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে।।
বাড়ীতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী।।

চন্দ্রাবতীর জীবনের কাহিনী খুবই দুঃখের। দ্বিজবংশী দাসের একমাত্র মেয়ে চন্দ্রাবতী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। ছোটবেলা থেকেই তিনি কাব্য চর্চায় মগ্ন ছিলেন। মা-বাবার কাছ থেকে তিনি পুরাণের গল্প শুনতে শুনতে নিজেও ছড়া কাটতেন মুখে মুখে। বাবা ছিলেন বিখ্যাত কবি। চন্দ্রাও বাবাকে পদ্ম-পুরাণ ও মনসামঙ্গল রচনায় সাহায্য করতেন।

তাদের গ্রামেরই ছেলে জয়ানন্দ। সেও কবিতা লেখে। চন্দ্রা ও জয়ানন্দের প্রাণের সম্পর্ক গাঢ় হতে তাই সময় লাগেনি। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কবিতায় ভালবাসার কথা অদান প্রদান করতেন। দ্বিজবংশীর রচিত পদ্মপুরাণ ও মনসা-মঙ্গলে জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের বিয়ের সম্বন্ধ যখন একেবারে স্থির সে সময় জয়ানন্দ এক মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়েন এবং ধর্মান্তরিত হন। এ আঘাতে চন্দ্রাবতীর হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। দীর্ঘদিন নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে তিনি স্থির করলেন আজীবন কুমারী থেকে শিবপূজা করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর বাবা ফুলেশ্বর নদীর তীরে একটা শিব মন্দির তৈরী করে দিলেন। এই সময় থেকেই চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। চন্দ্রাবতীর লেখা রামায়ণ সুক্ষ্ম ছন্দময় এবং অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী. তিনি এক জায়গায় সীতার ছবি এঁকেছেন এইভাবে—

"শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী

রামায়ণ রচয়িতা চন্দ্রাবতী দেবী

কাকলি ভট্টাচার্য

রামায়ণের ভাব- ভাষা ঘটনা আমাদের বাঙ্গালী জীবনের চিরাচরিত প্রতিচ্ছবি। তাই রামায়ণ আমাদের এত প্রিয়। আধুনিক জীবনে এর টান কমেনি তো মোটেই বরং অনেক বেশি বেড়ে গেছে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই রামায়ণ চর্চা হয়ে আসছে প্রতি ঘরে ঘরে। রামায়ণ নিয়ে নতু-ভাবে চিন্তা-ভাবনা গবেষণা চলছে বিদগ্ধ সমাজে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেকগুলি ভাষাতেই এর রূপান্তর ঘটেছে।

কবি কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালের বহু কবি রামায়ণের অঙ্গ-সজ্জা ও ছন্দ বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন তাঁ দর নিজস্ব ভ.ঙ্গমায়। ষোড়শ শতকে এই রকম একজন রামায়ণ রচয়িতার জন্ম হয় তাঁর নাম চন্দ্রাবতী দেবী। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন মনসা মঙ্গল ও পদ্মপুরাণ রচয়িতা বিখ্যাত দ্বিজ বংশীদাসের মেয়ে। তাঁদের বাড়ি ছিল ময়মন-সিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রামে।

চন্দ্রাবতী তাঁর লেখা রামায়ণে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"ধীরাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।।
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি।।

০ ০ ০ ০

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উছিলার পানি।।

সোনার পালঙ্ক পরে গো ফুলের বিছানী।
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধী কমল,
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল।

উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী
হেনকালে আস্‌লে তথায় গো কুকুয়া ননদিনী।
কুকুয়া বলিছে গো মম বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর ?
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া
দশমুণ্ড রাবণ রাজাগো দেখাও আঁকিয়া।
মুর্চ্ছিতা হইলা সীতা গো রাবণ নাম শুনি,
কেহবা বাতাস দেয় গো কেহ মুখে পাণি।"

পুজো এবং কাব্যে সমতা বজায় রেখে চন্দ্রাবতীর একাকী জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একভাবে। ছন্দপতন ঘটলো তার যখন একদিন জয়ানন্দ দেখা করতে চাইলেন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে। চন্দ্রাবতী রাজী হলেননা এতে। অনুতপ্ত অধীর যুবক ছুটে গেল শিবমন্দিরে ; সেখানে চন্দ্রাবতী দরজা বন্ধ করে পুজো করছিলেন। শত ধাক্কাতেও দরজা খুলল না। জয়ানন্দ মন্দিরের বাগান থেকে সন্ধ্যামালতী ফুল তুলে নিয়ে মন্দিরের দরজায় লিখে রেখে গেলেন তাঁর জীবনের শেষ কবিতা। পুজো শেষে চন্দ্রাবতী দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সব দেখলেন। মন্দির অপবিত্র হয়েছে মনে করে ফুলেশ্বরের ঘাটে গেলেন জল আনার উদ্দেশে। সেখানে মৃত জয়ানন্দকে ভাসতে দেখলেন নদীতে।

চন্দ্রাবতীর জীবনে ভালবাসার সাথে হারিয়েছিল সুখ এখন স্বস্তিটুকুও রইল না। তাঁর অসমাপ্ত রামায়ণ রচনা এর-পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। চন্দ্রাবতী রামায়ণ ছাড়াও 'মহুয়া'

'কেনারাম' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বিয়ের গান, পাশাখেলার গান, মিঠে সুরে গীত হয়ে এসেছে দীর্ঘদিন। একদিন শিব পূজো করতে করতেই ভগবানের চরণে নিবেদিত সেই প্রাণ বিলীন হয়ে গেল

আজও পূর্ববঙ্গের মাঝিরা সার দিয়ে সাঁঝের নৌকা বেয়ে যাবার সময় হয়তো গেয়ে ওঠেন সেই পরিচিত প্রিয় সুরের গান-

কি আনন্দ হইল সইগো রস বৃন্দাবনে,
শ্যামনাগরে খেলার পাশা মনমোহিনীর সনে,
আজি কি আনন্দ..... ।"

—C—

টাঙ্গাইলের আদি শিল্পীদের হাতে বোনা আমাদের প্রতিষ্ঠানের "টাঙ্গাইল" ঐতিহ্যের দাবীদার।

সব রকম দামের শাড়ী সব সময়ই মজুত থাকে।

৩৪নং জাতীয় সড়কের ওপর ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ডের গায়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান—

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ—ননী গোপাল দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।

ফোন : ফুলিয়া ৩৮/৩৯

নতুন বই

চল্লিশের কাচঘর দাম : তিন টাকা
জুলাই এবং প্রতীক্ষার পিওনেরা দাম : বার টাকা
স্বপন রায়
মিরান্দা প্রকাশনী
২৩৮, মানিকতলা মেন রোড, স্যুট ৫৪, কলকাতা-৭৪

০ ০ • •

স্বপন রায়ের দু'টি কাব্য গ্রন্থ চল্লিশের কাচঘর ও জুলাই এবং প্রতীক্ষার পিওনেরা। চল্লিশের কাচঘরে দু'টি দীর্ঘ কবিতার অবস্থান ঘটেছে। এর প্রথম কবিতাটির নামই চল্লিশের কাচঘর। এই কবিতায় শব্দের পর্দায় বোনা জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চালচিত্র। ছন্দময় কবিতাটি মনকে টানে অনায়াসে। পড়তে পড়তে পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ করে দেয়। এক জায়গায় কবির ভাবনা বড় বেশি বাস্তব। 'আমার সফেদ শূন্যতা/উত্তর তিরিশের দিন/তবু সে, কাচের সাদা গায়ে/জমাট রক্ত! ক্ষমাহীন।'

মাত্র চৌদ্দ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট বইখানির অলঙ্করণ, ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

মোট ৬৪টি ছোট ছোট কবিতার মোড়কে 'জুলাই এবং প্রতীক্ষার পিওনেরা ৪টি পর্বে বিভক্ত মূলত ছন্দের সূত্রেই গ্রথিত হয়েছে স্বপন রায়ের সুঠাম কবিতাগুলো।

'চিতা' কবিতার শেষ দু'টি লাইন অর্থবহ। 'চিতায় ফের অঢেল পুণ্যের পূর্ণ হোম/চিতায় প্রেম স্বনিকষিত হেম জানে না ডোম।'

আর একটি কবিতা "যুদ্ধ শেষ হলো"—'একটা দিনের অবসান হলো/যুদ্ধ শেষ হলো, তোমার যুদ্ধ/আমার যুদ্ধ।'

প্রত্যেকটি কবিতাই ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন রুচির। এই পার্থিব জীবনের নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে কবিতাগুলোতে। কাব্য পিপাসু মাত্রেই কবিতাগুলো পড়ে আনন্দ পাবেন।

—কাকলি ভট্টাচার্য

পণ্ডিচেরী তীর্থ পরিক্রমা দাম : বার টাকা
কবিসুন্দর অমিয় কুমার পাল

প্রকাশক : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র
ফ্ল্যাট ৮ ব্লক সি (এম, আই, জি)
বেলগাছিয়া ভিলা, কলকাতা-৩৭

কবির কলমে ভ্রমণের দিনলিপি 'পণ্ডিচেরী তীর্থ পরিক্রমা'। অমিয় কুমার পাল স্বভাব কবি। যখন যেখানে যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন তাঁকে একটি কবিতা লেখার কথা বললেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে দেবেন। এই কবিকে সঙ্গে নিয়েই আবাল্য বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপাত্র এবং অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক শ্রীসুবোধ রঞ্জন মৈত্রের গত '৮৬ র মাঝামাঝি পণ্ডিচেরী যাত্রা। যাত্রার শুরুপথেই কবির হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁরা একটি মোটা ডায়েরী আর কালি ভর্তি কলম। কবির চোখে দেখা ভ্রমণের দিনলিপি গাঁথা হয়েছে ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। শুধু চোখের দেখা নয় অনুভবের অন্তরে ধরা পড়েছে যে চিত্র তারই অনবদ্য গ্রন্থন গদ্যের পাতে। কবি অমিয় কুমার পালের অন্তরে আধ্যাত্ম সত্তার অবস্থান। তাই তাঁর দেখার নিরিখটা সাধারণের থেকে ভিন্ন। 'পণ্ডিচেরী তীর্থ পরিক্রমা' পড়ে আস্বাদ পেতে হলে স্বভাব কবির এই পরিচয়টুকু জানা দরকার।

মুদ্রণে ও প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

—মাধব ভট্টাচার্য

টুকরো খবর

বগুলায় মেলা

বগুলা প্রগতি সংঘের উদ্যোগে সাতদিন ব্যাপী এক বিরাট পুষ্প, শিশু ও সবজি মেলার আয়োজন করা হয় গত ২৬-জানুয়ারী '৯০। মেলা প্রাঙ্গনে মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন সাংসদ ডঃ অসীম বালা। মেলার উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বসু। বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলাটি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। প্রতিদিনই হাজার হাজার দর্শক প্রাঙ্গনটি দেখতে ভিড় করেন।

এস, কে, দে সরণী

ফুলিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সবুজপল্লী পর্যন্ত পাকা রাস্তাটি ফুলিয়ার রূপকার এস, কে, দের নামে করার প্রস্তাব উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসকের কাছে এই প্রস্তাব রাখেন এস,কে, দে স্মরণোৎসব কমিটির কনভেনর শ্রীগণেশ রায়। এস, কে, দে মেমোরিয়াল হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাও উঠেছে।

জনরঞ্জন কেন্দ্রের জনরঞ্জন

গত ২৩ জানুয়ারী জনরঞ্জন কেন্দ্রের উদ্যোগে নেতাজী জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৬ জানুয়ারী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৫ কিঃ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। ছেলে এবং মেয়েদের এক সঙ্গে দৌড় তাহেরপুর থেকে শুরু হয়ে ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্রের কাছে এসে শেষ হয়। এ বছর কাঁচরাপাড়া অ্যালমুনি ক্লাবের মিনু চন্দ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন আর কৃষ্ণনগর লিডারস ক্লাবের শ্যামল ঘোষ ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করেন। তাহেরপুর থেকে ফুলিয়া পর্যন্ত বহুদর্শক রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে এই দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন.

বড় আন্দুলিয়ায় লোক শিল্পী উৎসব

গত ২০শে জানুয়ারী থেকে ২১শে জানুয়ারী '৯০ চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে চাপড়া ব্লকের লোক শিল্পীদের নিয়ে দুই দিন ব্যাপী পঞ্চায়েত পর্যায়ে লোক সংস্কৃতি উৎসব পালিত হয়। সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। লোক সংস্কৃতি চর্চা ও প্রচারে পঞ্চায়েত এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা চক্রের সভাধিপতিত্ব করেন বিধায়ক শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৪১ জন লোক শিল্পী অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন লোকসংগীত ও বাদ্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন পঃ বঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নদীয়া জেলা শাখা। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পীকে ৫০ টাকা করে সাম্মানিক দক্ষিণা এবং ৫ টাকা করে যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়। আগত শিল্পী ও অতিথিদের স্বাগত জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীগোপীনাথ বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

গত ১৫. ১. ৯০ থেকে ২১. ১. ৯০ ফুলিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় বিভিন্ন দিনে। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন, ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, ফুলিয়া বিদ্যামন্দির, নিবেদিতা শিক্ষামন্দির, আনন্দ নিকেতন শিশু বিহার ও শিশুতীর্থের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সাহিত্য সৈকত এর লাইব্রেরী

আমাদের পত্রিকা অফিসে বহুদিন ধরে সংগৃহীত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন ও কিছু প্রাপ্ত বই নিয়ে একটা ছোট খাট পাঠাগার গড়ে তুলেছি। আমাদের পত্রিকার গ্রাহকরাই শুধু এই পাঠাগারটি ব্যবহার করতে পারবেন বিনামূল্যে সপ্তাহে একদিন-শুধুমাত্র রবিবার।

পত্র পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশকদের অনুরোধ আপনারা আপনাদের প্রকাশিত পত্র পত্রিকার প্রতি সংখ্যার একটি করে সৌজন্য কপি এই পাঠাগারে পাঠান। আমরা পাঠাগারে তা সংগ্রহ করবো এবং পাঠকদের কাছে তুলে ধরবো।

শান্তিপুর কো-অপারেটিভ কোল্ড ষ্টোরেজ সোসাইটি লিঃ

বেলেমাঠ, ফুলিয়া, নদীয়া ★ ফোন ঃ ফুলিয়া, ৪০

নদীয়ার চাষীভাইদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনসাধারণের সেবা করে আসছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সর্বত্র এবং সুনাম অক্ষুন্ন। পরিচালক মণ্ডলী সহ সমস্ত কর্মচারীগণই আলু সংরক্ষণ কারীদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখছেন। প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এখনও বিক্রয় হচ্ছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শেয়ার ক্রয় করতে পারেন। ফুলিয়া তথা নদীয়ার ঐতিহ্যময় এই-প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

এ বছর আলু সংরক্ষণের শেষ তারিখ ২৮. ২. ৯০

শ্রীকার্তিক চন্দ্র ঘোষ	নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সভাপতি	সহ সভাপতি
শ্রীবিমল কুমার বিশ্বাস	শ্রীঅভয় পদ পাণ্ডে
সম্পাদক	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রী কাছে-দূরের বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান ?

আধুনিক ব্যবসার জগতে, যে ব্যবসাই আপনি করুন না কেন তার প্রচার চাই। নইলে বহু প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের স্থান করে নেওয়া কঠিন।

আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আপনার স্থায়ী সম্পদ হিসাবে।

"সাহিত্য সৈকত" কে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপণের মাধ্যম করুন।

সাহিত্য সৈকত এ বিজ্ঞাপণের অর্থ আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের দরবারে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিজ্ঞাপণ জনিত পরামর্শের জন্যে যোগাযোগ

গণেশ রায় : সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাহিত্য সৈকত

আপনি যদি নদীয়া জেলা সম্পর্কে আগ্রহী হন, জেলার ইতিহাস, কৃষ্টি সংস্কৃতি জানতে চান 'সাহিত্য সৈকত' এর নিয়মিত পাঠক হোন। আমাদের প্রতিটি সংখ্যাই সুপরিকল্পিত। পুজো সংখ্যা সহ বছরে চারটি সংখ্যা বের হয়। গ্রাহকরা দশ টাকার বিনিময়ে চারটি সংখ্যাই পেতে পারেন বাড়িতে বসে। বিশেষ সংখ্যার জন্যে গ্রাহকদের বাড়তি পয়সা দিতে হয়না।

আগামী ১ বৈশাখ ১৩৯৭, সাহিত্য সৈকত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে—

কাকলি ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

এক আঁজলা সুখের খোঁজে

সম্পাদকীয়

কবির স্মরণে উৎসব

কোন মানুষই চিরদিন বেঁচে থাকে না। একদিন না একদিন তার মৃত্যু ঘটেই। তবে মৃত্যুর পরও কেউ কেউ বেঁচে থাকেন, সে বাঁচা অবশ্যি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকা। এ বাঁচা তাঁর সমকালকে উতরিয়ে উত্তরকালের প্রজন্মকে ছুঁয়ে থাকা।

আজ থেকে পাঁচশ সাড়ে পাঁচশ বছর আগে নদীয়া জেলার ফুলিয়ার মাটিতে এক কবি জন্মেছিলেন। —তিনি কৃত্তিবাস মুখুটি। রামসাগরের পারে বটের ছায়ায় বসে তিনি যে রামায়ণ লিখেছিলেন তাঁর রচিত সেই রামায়ণ তাঁকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। সাড়ে পাঁচশ বছর পেরিয়ে এসেও কৃত্তিবাসের এই যে বেঁচে থাকা তা' তাঁর আপন কীর্তির জন্যেই—তাঁর সৃষ্টির মাধুর্যের জন্যেই। বেঁচে আছেন তিনি তাঁর স্বমহিমাতেই। শুধু যে তিনিই বেঁচে আছেন তা-ই নয়, যে মাটিতে তিনি জন্মেছিলেন সে মাটিকেও তিনি গৌরবান্বিত করে গেছেন। আজও ফুলিয়ার বড় পরিচয়—কবি কৃত্তিবাসের জন্মভিটে বলে। —ফুলিয়ার মানুষের বড় গর্ব সেই পুণ্যভূমির বাসিন্দা বলে।

বিখ্যাত লোকদের মনে রাখার জন্যে আমাদের দেশে স্মরণোৎসব জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান করার রেওয়াজ আছে। কৃত্তিবাসকে ঘিরেও প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ রবিবার স্মরণোৎসবের আয়োজন হয় তাঁর ভিটে মাটিতে স্থানীয় কতিপয় ভক্তের উদ্যোগে। স্মরণোৎসবের সূচনা বাংলা ১৩২২ সালে। সেই থেকে পঁচাত্তর বছর ধরে একই ধারায় অনুষ্ঠান চলে আসছে। অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে চাই বৈচিত্র্য চাই নতুন ভাবনা চিন্তা চাই কিছু স্থায়ী গঠনমূলক কাজ সবচেয়ে বেশি করে যা চাই তা হল কাছে দূরের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তা যদি না করতে পারা যায় তো বটের ছায়ায় সামিয়ানার তলায় দাঁড়িয়ে নিজেদের জাহির করার প্রচ্ছন্ন অবস্থাটাই প্রকট হয়ে উঁকি মারবে।

SAHITYA SAIKAT
Jan-March, 1990
Regd. No. 421 2/81 R. N. I.

Rs. 2·00

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥

আমাদের গর্ব আমাদের শিল্পীদের জন্যেই। দক্ষ শিল্পীর হাতে বোনা নিত্য নতুন ডিজাইনের টাঙ্গাইল শাড়ীর দেশ-বিদেশের চাহিদা মেটাই আমরাই।

আপনিও আসুন আমাদের *সমবায় সদন-এ* সপরিবারে।

ফুলিয়া রেল স্টেশনের কাছেই।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প

সমবায় সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

ফুলিয়া : নদীয়া। দূরভাষ : ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য।
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশস্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়াপ্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১।	প্রকাশ স্থান	:	সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া।
২।	প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
৩।	প্রকাশক ও মুদ্রাকর	:	শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া।
৪।	নাগরিক	:	ভারতীয়
৫।	সম্পাদক	:	শ্রীমাধব ভট্টাচার্য (অবৈতনিক) সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া।
৬।	নাগরিক	:	ভারতীয়
৭।	স্বত্বাধিকারী	:	শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য
৮।	মুদ্রণ	:	মায়া প্রেস, কাঁকনাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলো আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

তারিখ
১. ৫. ১৯৯০

স্বাঃ কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশক

পঁচিশে বৈশাখ

যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে-
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞাপন নং ৬/৯০-৯১ তাং ১০. ৫. ৯০

বিজ্ঞপ্তি

গুজব ছড়াবেন না। গুজবে কান দেবেন না। মিথ্যা অপবাদ সমাজের কলঙ্ক। নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছেলেধরা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। কিছু অসৎ ও সুযোগ-সন্ধানী লোক এই ধরণের গুজবের পিছনে সক্রিয়। এদের প্রশ্রয় না দিয়ে প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসুন। নিরীহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষ যাতে অহেতুক নিপীড়িত বা লাঞ্ছিত না হন সেদিকে সর্তক থাকুন। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

নারায়ণ চন্দ্র বসু

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক

নদীয়া

Advt. No. 3/90-90 **Dated 7. 4. 90**

মে দিবসের শতবার্ষিকী উদযাপন

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা বেকারীর বিরুদ্ধে কাজের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

জীবন জীবিকার মান উন্নত করার

সংগ্রামে সমস্ত শ্রমজীবী

মানুষ এক হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞাপন নং ৫/৯০-৯১ তারিখ ২.৫.৯০

মেয়ে ধরেছে বায়না
নেবো সোনার গয়না
এ. টি. জুয়েলার্সে আয় মা।
গড়িয়ে দেবো সাতনরী হার চন্দনা।

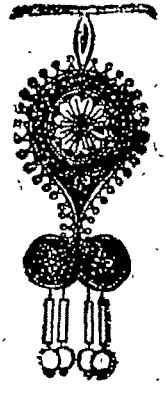

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ-শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

আমাদের বিশেষত্ব

কম সোনায় গহনা
জড়োয়া অলংকার তৈরী
ডিজাইনে নতুনত্ব
গ্রহরত্নের সরবরাহকারী

□ ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গহনার কথা ভাবলেই এ. টি. জুয়েলার্সের কথা ভাবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতি বুধবার আমাদের দোকান পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'

মাধব ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের যখন ২৯ বছর বয়েস অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ তখন মানসীর জন্ম। সেই মানসীর আজ শতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের অনুভবের রক্তে গড়া মানসী শতবর্ষের দুয়ারে এসে আজও প্রেমময়ী সুন্দরী মানসী। শতবর্ষ পরের প্রেমিক যুবক আজও নতজানু হয়ে মানসীর কাছে প্রেম ভিক্ষা করে। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের ভালবাসা মানসীকে উজার করে ঢেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে মানসী কখনও মানবী কখনও প্রকৃতি। জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা হাসি কান্নায় গড়া মানসীর অবয়ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবের সত্তাটিকে উপহার দিয়েছেন তাকে।

"মানসী" গ্রন্থ আকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তবে মানসীর শরীর লেপটে রয়েছে শব্দের যে গাথা মালা তার সৃষ্টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যে। মোট ৬৬টি কবিতার সংগ্রহ নিয়ে মানসী কাব্য। এর কোনটি জোড়া সাঁকোর বাড়িতে বসে লেখা, কোনটি বা পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে, কোনটি শান্তি নকেতন, কোনটি সোলাপুর বা গাজিপুর, কোনটির বা জন্ম সমুদ্রপথে চলতে চলতে কোনটি বিলাতে। তবে মানসী কাব্যের বেশির ভাগ কবিতাই লেখা হয়েছে বিহারের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী গাজিপুরে বাসকালীন সময়ে।

মানসীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেম ও প্রকৃতিকে ঘিরে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন-প্রেমই মানসীর মুখ্য আবেদন। এই আবেদন কখনও রক্ত মাংসের প্রিয়তমার প্রতি কখনো বা

নিসর্গ প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ এক কবির আত্মোপলব্ধিতে পরিণত। কোথাও সুখ কোথাও দুঃখ কোথাও বা অনুভবের সুর বেজেছে। দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি কাজ করেছে কবির অন্তরে "মানসী" রচনাকালে। একদিকে রয়েছে দুঃখ সুখ বিরহ মিলন ভালবাসা অন্যদিকে সৌন্দর্যের আকাঙ্খা। এই বৈপরীত্যের ফলেই তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে কখনও আশা কখনও নিরাশা কখনও বা বিষাদের প্রকাশ।

এই দ্বন্দ্ব, এই বিপরীত শক্তির পারস্পরিক বৈপরীত্য শুধু যে মানসীতেই রয়েছে তা নয়, "সোনারতরী" এবং 'চিত্রা' কাব্যেও তা লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন-"এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দু'টো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। এই জন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে বৈরাগ্য আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষন।

মানসী কাব্যের কবিতাগুলো সম্পর্কে এক আলোচক মন্তব্য করেছেন-"সামগ্রিক ভাবে মানসীর কবিতাবলীতে যে বিষাদ বৈরাগ্যের প্রভাব আছে তার কারণগুলি এই রকম—

১। কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু ও তজ্জনিত শোকাভিজ্ঞতা ও দীর্ঘস্থায়ী শোকবেদনা।

২ ইন্দ্রিয়জ প্রেমের সংকীর্ণতায় কবির ক্লান্তি ও অবক্ষয় এবং দেহ ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের জন্য আকুলতা।

৩। প্রকৃতির স্নেহ প্রেমের বদলে একটি নিষ্ঠুর জড় নির্মম রূপ দর্শনের আকস্মিকতা ও বিষাদ।

৪। বাঙালী জীবনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ধর্মান্ধতায় কবির বেদনা।

৫। দেশপ্রেমের নামে কতিপয় দেশহিতৈষী যুবকের অন্ধ রক্ষণশীলতায় কবির মর্মদাহ ইত্যাদি।"

বিভিন্ন আলোচক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী যে পৃথক হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানসী কাব্যের কবিতাগুলোকে যদি স্থান কালগত ভাবে বিন্যাস করা যায় তো দেখা যাবে ১২৯৪ সনের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে জোড়াসাঁকো এবং ৪৯ নং পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে বসে যে ১৬টি কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে রয়েছে যেমন- "ভুলে" "ভুল ভাঙ্গা" "বিরহানন্দ" "শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা" "সিন্ধু তরঙ্গ" "নিষ্ফল কামনা" "বিচ্ছেদের শান্তি" "তবু" "সংশয়ের আবেগ" "হৃদয়ের ধন" "নিভৃত আশ্রম" প্রভৃতি কবিতাগুলো। "শূণ্যগৃহে" "নিষ্ঠুর সৃষ্টি" "জীবন মধ্যাহ্ন" "প্রকৃতির প্রতি" "শ্রান্তি" "মরণ স্বপ্ন" "বিচ্ছেদ" "আকাঙ্খা" "একাল ও সেকাল" "কুলুধ্বনি" 'মানসিক অভিসার' "বধূ" 'ব্যক্তপ্রেম' 'গুপ্তপ্রেম' 'অপেক্ষা' প্রভৃতি ২৭টি কবিতা ১২৯৫ সনের বিভিন্ন সময়ে গাজিপুরে বসে লেখা। ১২৯৬ সনের বৈশাখ থেকে ১২৯৭ সনের কার্তিক পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলোর রচনা স্থান সোলাপুর, শান্তিনিকেতন, কলকাতা, সমুদ্রপথ এবং বিলাত। এই সময়ে তিনি লিখেছেন মোট ২৩ টি কবিতা। যেমন 'বর্ষার দিনে' 'ধ্যান' 'পূর্বকালে' 'অনন্তপ্রেম' উপহার. "মেঘদূত" 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"মানসীর প্রথম স্তরের কবিতাগুলোর মধ্যে

যে একটি বিষাদ মাখা ভাবনা চাপা রহিয়াছে তাহা অস্পষ্ট নহে।"

'নিষ্ফল কামনা' 'শূন্য গৃহে' 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' প্রভৃতি কবিতায় বিষাদের প্রকাশ স্পষ্ট দেখতে পাই।

"নিষ্ঠুর সৃষ্টি" কবিতায় কবির আত্মনিবেদন ঘটেছে এইভাবে

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধদৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে—
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।"

"নিষ্ফল কামনায়" ব্যক্ত হয়েছে—

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

আর "শূন্যগৃহে"তে কবির সকরুণ আবেদন—

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!
প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও
তা বলে কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা বলে কি জননীর বাজেনা বেদনা?

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ ৮০ বছরের জীবনে মৃত্যু শোক এসেছে ঘুরে ফিরে বারে বারে। বহু আত্মজের মৃত্যু তিনি দেখেছেন নিজের চোখে। অনুভব করেছেন নিজের অন্তর মনে, প্রকাশ করেছেন ভাষা দিয়ে সেই দুঃখ শোকের বেদনা।

রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন কবি কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অসুস্থ মেয়েকে প্রায় প্রতিদিনই দেখতে যান মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে। মৃত্যুর দিন সকালেও গিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো। গাড়ি থেকে নামতে যাবেন রবীন্দ্রনাথ, এমন সময় শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজ। বুঝলেন, তার মেয়ে আর নেই। গাড়ি থেকে নামতে গিয়েও নামলেন না। মৃত মেয়ের মুখ বোধ হয় দেখতে চাইছিলেন না কবি। ফিরে এলেন তক্ষুণি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের কান্না ভরে গেল পাতার পর পাতা কবিতায়। এমনি করেই একদিন বিদায় দিয়েছিলেন মাকে, বাবাকে, শিশুপুত্র শমীকে, প্রিয়তমা স্ত্রী মৃণালিনীকে, বৌঠান কাদম্বরীকে। আরও কত অন্তরঙ্গ প্রিয়জনই তো চলে গেছে অকালে।

বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে মায়ের মৃত্যু যে শূণ্যতায় ভরে দিয়েছিল তার খানিকটা সমবয়সী বৌঠান কাদম্বরীদেবী (দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) এসে পুরণ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী ছিলেন সমবয়সী। একে অপরের খেলার সঙ্গী। বাল্য কৈশোরের উচ্ছলতা ছিল দুটি প্রাণে। জোড়াসাঁকোর অভাব হীন ঠাকুর পরিবারে অনেক কিছু পাওয়ার মাঝেও কোথায় যেন একটা শূন্যতা ছিল কাদম্বরীর জীবনে। কেমন যেন এক বিষন্নতা আচ্ছন্ন করে রাখতো তাঁকে। এই শূণ্যতাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্ট করতো রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর অন্তরাত্মার কাছাকাছি এসেছিলেন বোধ

করি এই শূণ্যতা, এই বিষাদ, এই নৈরাশ্যের উপলব্ধিতেই। কাদম্বরীদেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে ভালবাসা তা শ্রদ্ধা মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কাদম্বরীদেবীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু জনের মনে বহু কৌতূহল আছে আজও। কাদম্বরীদেবীর আত্মঘাতী হওয়ার কারণ অজ্ঞাত। রহস্যাবৃত বলেই তা কৌতূহল জাগায়। এ যেমন ঠিক তেমনি কৌতূহল প্রকাশের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কৌতূহল দমনই উদার চিত্তের পরিচয় ঘটায়।

কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে যে কবিতার জন্ম তার অনেকগুলোই "মানসী" কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রিয়তমা স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর কবি তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে সব কবিতা লিখেছিলেন তা "স্মরণ" নামক কাব্যগ্রন্থে মোড়া আছে।

"কড়ি ও কোমল" কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ।

মানসীকে বহুরূপে দেখেছেন কবি। বহুরূপে তাকে সাজিয়েছেন। মানসীর প্রতি কবির যে প্রেমাকাঙ্খা তা নিবেদিত হয়েছে সুখে দুঃখে জীবনে মরণে। ভুল করে প্রেমাস্পদের কাছে এসেও উছলে পড়েছে তার অভিমানী প্রেম। "ভুলে" কবিতায় তাই দেখতে পাই—

ব্যর্থা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখ খানি

লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস
নয়ন কূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

আবার "ভুল-ভাঙা" কবিতায়—

নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া-
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর!

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমি ভালবাসি অনেককে, কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে। সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।"

রবীন্দ্রনাথের মানসী সীমা ও অসীমের কল্পনায় গড়া এক প্রতিমা। মিলন ও বিরহের সুরে বাঁধা তার। কারো কারো অনুমান মানসী কল্পনারীর মূলে কোন, বাস্তব নারীর স্মৃতি আছে, মৃত্যু তাকে অসীমলোকে নিয়ে গেছে, কবির মানস জগতে তার অধিষ্ঠান-তাই মানসী। মানসীর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে কে? তিনি কি কাদম্বরী? সঠিক করে কারো জানা নেই তাহলেও এ সত্য একেবারে উপেক্ষারও নয়।

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।"

এই "তুমি" কে যে কিনা কবির প্রাণ হরণ করেছে ; কাকেই বা কবি নিত্য স্মরণ করেন ? এ জিজ্ঞাসা অজস্র প্রাণের অনন্ত কালের।

"মানসী" কবিতা গুচ্ছের একপ্রান্তে আছে নিষ্ফল কামনা আর এক প্রান্তে বাসনাহীন সৌন্দর্যের আবিলতা। অন্ধকার আকাশে তারাদের মধ্যে স্বর্গের আলোর যে অসীম রহস্য লুকিয়ে থাকে নারীর দেহরূপের মধ্যে যে অমৃত আবৃত হয়ে থাকে তা কবিরও অনধিগত।

"মেঘদূত" কবিতায় কবি তাঁর অবরুদ্ধ হৃদয় বেদনা অনেকটা হালকা করতে পেরেছেন—

লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক যেথা
চির নিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

বিরহের এই স্বর্গলোকে অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে চিরনিশি একাকী যে বিরহিণী প্রিয়া বাস করছে সেই হল কবির মানস প্রতিমা। সীমায় বাধা স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হয়ে অসীম সৌন্দর্যলোকে নির্বাসিত বলেই সে চিরবিরহিণী কিন্তু কবির সঙ্গে তার প্রেম মিথ্যা নয়। সেই প্রেমের স্মৃতিকে চিরজীবি করার জন্যেই তাকে জন্মান্তরের বলে দাবী করেছেন কবি "অনন্ত প্রেম" কবিতায়।—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীতহার
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

শতবর্ষে কবিশেখর

কাকলি ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতকে রবীন্দ্রানুসারীদের মধ্যে কবি কালিদাস রায় ছিলেন অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হল।

১২৯৬ সালের ৭ই আষাঢ় (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন) বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কালিদাস রায়ের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও মা রাজবালা দেবী। তাঁরা বংশ পরম্পরায় বৈদ্য বৈষ্ণব। সাধক কবি লোচন দাসের উত্তর পুরুষ কবি কালিদাস রায়।

কবি পাঁচ বছর বয়স থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাকীমার কাছে কড়ুই গ্রামে কাটিয়েছেন। তখন তাঁর বাবা ছিলেন কাশিমবাজার মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কালিদাস গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়তেন এবং শিশু বয়স থেকেই পল্লী বাংলার সরল-সৌন্দর্য দেখে আবিষ্ট হতেন। তাই পরবর্তী কালে তাঁর কাব্যে পল্লী ভাবনা ঘুরে ফিরে এসেছে বার বার।

গ্রামের পড়াশোনার শেষে কবি চলে এলেন বাবার কাছে কাশিমবাজারে এবং ভর্তি হলেন খাগড়া এল্ এম এস স্কুলে। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর শরীর স্বাস্থ্য তেমন ভাল থাকত না কিন্তু তিনি যথেষ্ট মেধাবী হওয়ায় বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে পড়াকালীন কালিদাস আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন এবং সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন। এই সময় থেকেই তাঁর কাব্যচর্চাও শুরু হয়। কাশিমবাজারের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন ইতিহাস এবং অরণ্যের আদিম পরিবেশ তাঁর কাব্য-চর্চার সহায়ক হয়েছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। কৈশোরে লেখা তাঁর

প্রায় সমস্ত কবিতাগুলি নিয়ে তিনি এই সময় 'কুন্দ' নাম দিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিই তাঁর প্রথম কাব্যের বই। এই কাব্যখানি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পেয়ে তাঁকে উৎসাহ ও প্রশংসা জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় কবির বহু কবিতা প্রবাসী, ভারতী, জাহ্নবী, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস ডিষ্টিংশন সহ বি, এ পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতায় কিছুদিন দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পড়েন। এই সময় তিনি কিছু বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ কাজে মনোনিবেশ করেন। কলেজে পড়ার সময় কবি যে সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন, পরে তা 'কিশলয়' নামে কাব্যের আকারে প্রকাশ পায়। পরবর্তী কালে 'কুন্দ' ও 'কিশলয়ের' বেশ কিছু কবিতা নিয়ে 'বল্লরী' কাব্যের রূপ দেওয়া হয়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উপদেশানুসারে কবি কালিদাস একশটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করে কাব্য জগতে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কবির বিয়ে হয় ছোটনাগপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুকৃতি দেবীর সঙ্গে। পরের বছর তিনি রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তাঁর জীবনের প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে শিক্ষকতার কাজে। এর মধ্যে উলিপুরে বসবাসের দিনগুলিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সময়। পরবর্তীকালে কবি উলিপুরের স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হয়েছিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায় প্রধানত তাঁর বন্ধুদের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে। 'পর্ণপুট' তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল। এই কাব্য মূলত পল্লীভাবনা দিয়ে গাঁথা। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রজবেণু' নামে তাঁর আর একটি কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে

'ঋতুমঙ্গল' কাব্যে সংযোজিত হয় তাঁর প্রকৃতি ভাবনার কবিতা-গুলি। এইভাবে প্রায় দ্রুতলয়ে অনেকগুলি সোনার ফসল উঠে এলো তাঁর কাব্যের আঙ্গিনায়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম দেখা হল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। উলিপুরে বাসকালে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত করেন। সে বছরই তিনি উলিপুর ছেড়ে বড়িষা হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। দীর্ঘ এগার বছর সেখানে কাটিয়ে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বড়িষা স্কুল ছেড়ে,কবি ভবানী-পুর মিত্র স্কুলের শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুল থেকেই অবসর নেন।

কলকাতায় আসার পর তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্যগুলি 'ক্ষুদকুঁড়া' 'লাজাঞ্জলি' 'চিত্তচিতা' 'হৈমন্তী' 'বৈকালী' 'আহরণ' 'সন্ধ্যামণি' 'গাথামঞ্জরী' পূর্ণাহুতি' 'তৃণদল' 'রসকদম্ব' ও দন্তরুচি কৌমুদি' নামে কৌতুক রসের কাব্য প্রকাশ পায়।

কবি শেখর কালিদাস রায়ের লেখা বহু কবিতা আজও স্কুল কলেজের পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত। তাঁর 'হৈমন্তী' কাব্যের অন্তর্গত বিখ্যাত 'ছাত্রধারা' কবিতাটির গভীর অনুভূতি অভি-ব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা আজও মনকে নাড়া দেয়। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন হল—

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে,
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।
ভালবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি
শাসন তর্জন করি' শিখাই প্রহর ধরি,
থাকে নাকো, হায়, কোনো স্মৃতি!

কালিদাস রায় মূলত কবি হলেও পরবর্তীকালে তিনি বহু গদ্য সাহিত্য রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর লেখা গদ্য, পদ্য, ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় একশ দুই এর মত হবে।

কবি কালিদাস সারা জীবন বিভিন্নভাবে শিক্ষাকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী হিসেবে আজও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কলকাতা, পাঞ্জাব, ঢাকা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও প্রশ্ন প্রনয়ণকর্তা ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কবিশেখর বহু সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবি, ও ফারসি কবিতার অনুবাদ করেছেন। কিছু শিশু সাহিত্যও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর লেখায় 'গ্রাম বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙ্গিনা, তুলসীমঞ্চ ও মাধবী কুঞ্জের' প্রাধান্য থাকলেও বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি লিখেছেন অজস্র লেখা। কবির শেষ বয়সের লেখা রম্যরচনাগুলি যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত দিকেই যে তাঁর সমান দক্ষতা ও নজর ছিল এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষা ছাড়াও কবি বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'রসচক্র' নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি একটি সেতু গড়ে তোলেন নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যকদের মধ্যে। এর সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।

সাহিত্যে ও কাব্যে কবির অসীম কৃতিত্বের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সরোজিনী' সুবর্ণপদক ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জগত্তারিণী' সুবর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে 'আনন্দপুরস্কার' দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চোখের ছানি কাটাতে গিয়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু

১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুণরায় অপারেশন করার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসে। ১৯৬৮খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী কবি তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে হারান ঐ বছরই তাঁর 'পূর্ণাহুতি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান এবং রবীন্দ্র মেলায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সর্বোচ্চ 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী কতৃক ডি, লিট এবং ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কতৃ'ক তিনি মরণোত্তর ডি, লিট উপাধিতে ভূষিত হন।

শেষ বয়সে কবিশেখর কোমরের হাড় ভেঙে দীর্ঘদিন শয্যা-শায়ী ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর ঐ অবস্থায় কবির মৃত্যু হয়। এই গুণী-কর্মবীর মানুষটিকে আজ আমরা আর তেমন করে মনে করিনা। তিনি কেবলমাত্র তাঁর কাব্যের সাথে বইয়ের পাতার মধ্যে আবদ্ধ। তাই মনে হয় এই ক্ষণজন্মা কবি, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক হয়তো সারাজীবন অনেক সম্মান পেয়েছেন, তবু কবিশেখর কালিদাস রায়ের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণ আজও হয়নি।

—×—

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান বছরে জেলার বিভিন্ন শিশু কল্যাণ সংস্থার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগ্রহী সংস্থাকে আবেদন পত্র সংগ্রহের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে কার্য্যকালের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান হচ্ছে। আবেদন পত্র আগামী ৩০শে জুন '৯০ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে কার্য্যকালের মধ্যে সংস্থার কার্য্যকলাপ সম্বলিত প্রমাণ সহ জমা দিতে হবে।

নারায়ণ চন্দ্র বসু
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
নদীয়া

হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে ?

ডাঃ হরিশঙ্কর কুণ্ডু ডি, এম, এস (ক্যাল) ; পি, ই, টি, এফ, ডব্লু, টি (ক্যাল)

গোটা বিশ্বের গড় হিসাবে নাকি বলা হয়েছে যে প্রতি মিনিটে একটা করে শিশু জন্মায়। তবে একথা সুস্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই যে কতগুলো শিশু সুস্থ দেহ-মন নিয়ে মাতৃ-জঠর থেকে এই ধরাধামে নেমে আসে। আবার একথাও পুরোপুরি বিজ্ঞান সম্মত যে "শিশুর পিতা লুকিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে"।

তাহলে এখন যেটা দাঁড়ালো সেটা খুবই জটিল ; কারণ পিতা দিলেন ২৩টা ক্রোমোজোম আর মাতা দিলেন ২৩টা ক্রোমো-জোম ; অর্থাৎ শিশুর প্রতি পিতা এবং মাতার আধাআধি শেয়ার। তাই হয়তো কোনো আইন দিয়ে শেয়ার মার্কেটের এই অনুপাতকে পালটানো সম্ভব হচ্ছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাবার হাঁপানি ডায়াবিটিস আর মায়ের হৃদরোগের অংশীদার হয়ে যে শিশু পৃথিবীতে এলো সে তো বহন করে আনতেই পারে অ্যাসিড-ফ্যাষ্ট ব্যাসিলাস ; যা তার আগামী প্রজন্মের বিশেষ পুঁজি। এভাবে জেনারেশনের পর জেনারেশন হয়ে চলেছে জটিল থেকে জটিলতর-জটিলতম ! কে এই জট ছাড়াবে ? কি ভাবেই বা এই জটিলতা সৃষ্টি বন্ধ হবে ?

লংকাপুরীতে চামুণ্ডাদেবীর পূজার আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছাড়া এই পূজার পৌরোহিত্য করা যাবে না ; আর ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ একমাত্র রাবণ তাই লংকেশ্বর রাবণকেই পুরোহিত পদে বরণ করা হ'ল।

প্রকৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; তাই প্রাকৃতিক চিকিৎসাই পারবে

আমাদের এই জটিলতা দূরীভূত করতে ; অর্থাৎ বক্তব্য এই-যে চিকিৎসা পদ্ধতি পুরোপুরি প্রকৃতির সহজ-সরল এবং বোধগম্য নিয়মকে অনুসরণ করে তাকেই তো পৌরোহিত্যের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

মাতৃজঠরে থাকার সময় থেকেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের ভিত্তিভূমি তৈরী হয়ে যায়। গর্ভবতী মায়ের অস্বাভাবিক মানসিক লক্ষণগুলো ভ্রূণের উপরে সরাসরি বিক্রিয়া ঘটায়। এই অস্বাভাবিকতা কিভাবে দূরীভূত হবে ?

গর্ভাবস্থায় শিশুর মায়ের morning sickness অ্যালবুমিনুরিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, অবসাদ, ভয়, অনিদ্রা শিশুর আগামী দিনের তড়কারোগের ইঙ্গিত বহন করে। তাহলে উপায় ? এ-ছাড়া আছে Thretend Abortion এর হুমকি !

এ গেল মাতৃজঠরে থাকাকালীন বাধা। এবারে ২৭০-২৮০ দিন ফুরিয়ে এলো ; এখন শিশুকে অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করতে হবে। প্রবেশ করতে হবে সেই পৃথিবীতে যেখানে আছে ভয়ে ভরা প্রচুর সংকেত অথবা অপ্রচুর শান্তির ইঙ্গিত। প্রবেশ করতে হবে সেই কোন্দলময় জগতে যেখানে কোন্দল আছে সংসারে, কোন্দল আছে সমাজে, কোন্দল আছে প্রদেশে-দেশে-মহাদেশে। হঠাৎ একদিন হয়তো বা বালকটির একটা ফুসফুস হয়ে যাবে নিস্তব্ধ হয়তো বা তার হৃৎপিণ্ডের একাংশ জানাবে তীব্র প্রতিবাদ অথবা একটা কিড্‌নি করে বসবে ভয়ানক অভিমান। কিন্তু কেন এই সব অসামাজিক আচরণ ? হে ত্রিকালজ্ঞ পুরোহিত বল এখন আমরা কি করবো ?

এ জগতে সর্বপ্রথম অপারেশন করে যে শিশুকে আনা হয়েছিল তিনি হলেন জুলিয়াস সিজার। তাঁর নাম অনুসারে ঐ অপারেশনটার নামকরণ করা হয়েছে সিজারিয়ান অপারেশন। আগামী দিনে জুলিয়াস সিজার হয়ে উঠলেন

এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র। আজও শোনা যায় যে শিশুর জন্মক্ষণ হয় খুবই যন্ত্রণাময় সে নাকি হয় খুবই মেধাবী অথবা প্রতিভাবান। তবে এই মন্তব্যের পিছনে কোন বিজ্ঞান আছে কিনা অথবা নিছকই প্রবাদ এটা সঠিক করে এখনো বলা শক্ত।

সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত এই সিজার আজ অকটোপাশের মত ছেয়ে ফেলেছে! একদিকে মহামান্য সরকারের **M. P. T. Act** ; গর্ভনিরোধক বটিকা আর একদিকে মেধাবী সন্তানের চাহিদা, ক্রমশঃ আমাদের মায়েদের করছে সবল না দুর্বল না পঙ্গু তা তাঁরাই ভাল করে বলতে পারবেন। যদি এতে মায়েরা সবল হন, তাহলে তো কোন সমস্যাই রইল না; আর যদি দুর্বল হন তাহলে দুর্বলতা কাটানোর অবশ্যই প্রয়োজন আছে আর যদি পঙ্গু হন তখন

(ক্রমশঃ)

— 0 —

শিশুদের কাছে ছড়া, গল্প, কবিতা চাইছে :-

"সাহিত্য সৈকত"

কবিতার পেছন পৃষ্ঠায় নিজের নাম, ঠিকানা, বয়েস, স্কুলের নাম, ক্লাস উল্লেখ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দাও আমাদের ঠিকানায় বা হাতে নিয়ে নিজেই চলে এসো!

নতুন বই

এক চিলতে চিমটি দাম : দশ টাকা

সুধীরেন্দ্র নাথ পাত্র

"সুদীপ্ত ভিলা" সোনাপটি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া,

"এক চিলতে চিমটি" সুধীরেন্দ্র নাথ পাত্রের লেখা রসরচনার সংকলন। ইদানীং রসরচনা বা রম্যরচনা লেখার প্রবণতা কমে এসেছে। লেখকরা সিরিয়াস, পাঠকরাও সিরিয়াস। উভয়ে উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত। আসলে শব্দের কথামালায় পাঠককে রসের নৌকোয় ডুবিয়ে ভোলার লেখকও কমে এসেছেন। 'এক চিলতে চিমটি'' সংকলনটিতে ছোট ছোট ২১টি রম্যরচনার অবতারনা করেছেন লেখক সুধীরেন্দ্রনাথ। রসের গল্প লিখতে গিয়ে শুরুতেই তিনি "রস হতে সাবধান" হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বলেছেন মামা ভাগ্নের সম্পর্কের গল্প, ব্যাচেলার থাকার বিড়ম্বনা, সংসারের কথা, রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা, ঘোড়ার ডিমের অমলেট এমনি সব হাসির গল্প।

বইয়ের নামকরণ 'এক চিলতে চিমটি' সেও নরম হাতে রসেরই চিমটি। না বলা সেই গল্পটি রসিক পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

ছাপা ও প্রচ্ছদ চলন সই। রসিক পাঠকেরা বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন।

হে প্রগাঢ় পিতামহী দশ টাকা

সম্পাদনা : নাজেম হাজরা

প্রকাশকের নাম ঠিকানাবিহীন 'হে প্রগাঢ় পিতামহী' পাঁচ

কবির এক কাব্য সংকলন। এই পাঁচ কবি হলেন নাজেম হাজরা, নজির হোসেন, গোপাল জৈন, সকলদীপ সিংহ ও নির্ভয় মল্লিক। ভূমিকা পড়ে জানা যায় এঁদের মধ্যে শেষ তিনজন হিন্দীভাষার কবি। একেক জনের দশটি করে মোট পঞ্চাশটি কবিতার কাব্যসংকলন বর্তমান গ্রন্থটি।

সকলের সব কবিতা সমান ভাবে না টানলেও কিছু কিছু কবিতা পড়তে গিয়ে চোখ থেমে যায় কবিতার লাইনে কবির শব্দ চয়নের সঙ্গে পাঠকের অনুভবের অন্তরটি মিশে যেতে চায়। নাজেম হাজরা তাঁর 'মুক্তি নয়' কবিতায় বলেছেন— ভালবাসি তোমাকে / বনসোনার কুঁড়ির মত হলুদ ভালবাসা / মুক্তি নয় / আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরো — আরও /

ভালবাসার কাছে সমর্পিত নাজেমের অন্তর মন। "নিষ্ঠা-ময়" কবিতার একছত্রে তাঁকে বলতে দেখি— কেউ কারো জন্যে নয় -তবুও / সম্পৃক্ত হতে হয় ভালবেসে পার্থিব উন্মুখ উজ্জীবন /

অন্য এক কবি নজির হোসেনের অনুভব কথা বলে এই ভাবে— চাঁদের আলোক সেখানে যাবে না, বারণ আছে / প্রিয়ার বুকের গোরস্থানে। ইতিহাস / মানুষ একবার মরতে পেলে / কতবারই না জিন্দা হয়ে ওঠে /

গোপাল জৈন এর "স্পন্দন" 'চৌরাস্তা' সকলদীপ সিংহর 'নিঃসঙ্গতা' নির্ভয় মল্লিকের 'প্রতীক্ষা' কবিতাগুলো ভাবায়।

বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদ অতি সাধারণ।

পত্রপত্রিকা

অঙ্গীকার : সম্পাদক-রামরঞ্জন রায়

রাঙাভূমি : সম্পাদক-কাশীনাথ সাহা

মোনালিসা : সম্পাদক-মানস কুমার চিনি

তিনটিই সাহিত্য পত্রিকা এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে

প্রকাশিত। প্রথমটি মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে, দ্বিতীয়টি গড়বেতা এবং তৃতীয় পত্রিকাটি মেচেদা থেকে প্রকাশিত।

রামরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'অঙ্গীকার' একটি বলিষ্ঠ পত্রিকা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং জেলার কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এই পত্রিকার সপ্তমবর্ষের ৩য় সংখ্যায়। প্রতিটি রচনাই সুনির্বাচিত। গল্প কবিতা ছাড়াও এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলো বলিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ। সম্পাদনায় উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকাটি হাতে নিলেই।

"রাঙাভূমি" পত্রিকাটিও গল্প কবিতা প্রবন্ধের পরিবেশক। অধ্যাপক প্রণব রায়ের লেখা সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা: মেদিনীপুর লেখাটি আগ্রহ ভরে পড়ার মত। গল্প কবিতার মানও মোটা-মুটি! তবে ছাপার ব্যাপারে যত্নের অভাব চোখে পড়ে।

মানসকুমার চিনি সম্পাদিত মেনোলিসার বইমেলা ৯০ গল্প ও কবিতা সংখ্যা আমরা পেয়েছি। তুলনামূলক ভাবে অনেক কবিতার থেকে অনেকগুলো গল্প অর্থবহ হয়ে উঠেছে। পত্রিকাটি হিমহাম বিজ্ঞাপন বিহীন। এদিক থেকে দু:সাহসিক অভিযান। সম্পাদক মশাই সাহসিকতার পরিচয় রাখছেন অবশ্যই। তবে পত্রিকাটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ বড় করে চোখে পড়ল। যেমন সম্পাদকীয় নিবন্ধে "ব্যাতীক্রম" "বিনীময়" "হিনমন্যতা" কবিতায় "দ্বন্দ" "কাদেনিতো" বানানের এই ধরনের আরো অনেক ভুল পত্রিকার মান খর্ব করেছে।

রোদ বৃষ্টি আমি বিনিময় পাঁচ টাকা
হাসেম হাজরা, শ্যামসুন্দর, বর্ধমান।

ছোট ছোট মোট ৪৫টি কবিতার কাব্য সংকলন 'রোদ বৃষ্টি আমি'। কবির মনের অন্তরঙ্গ ছাপ পড়েছে কবিতাগুলোয়। সবগুলো কবিতা আমাদের ভাল লাগেনি। "দায়তা তুরন্ত এখনো" "নিরিবিলি" "রোদরঙ" "পৌষ তোলার বেলা" প্রভৃতি কবিতা পড়তে ভাল লাগে। ছাপা ও বানানের প্রতি আরো দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

।। টুকরো খবর ।।

চুয়াডাঙ্গায় ক্ষুদিরাম জন্ম শতবর্ষ উৎসব পালন

চাকদহের অন্তর্গত নেতাজী পাঠাগারের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা শহীদ ক্ষুদিরাম জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটি গত ৩০ মার্চ-১ এপ্রিল '৯০ চুয়াডাঙ্গায় ক্ষুদিরাম জন্ম শতবর্ষ উৎসব পালন করে। ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পথ পরিক্রমা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, গান, আলোচনা প্রভৃতি তিন দিন ধরে ক্ষুদিরামের স্মরণে উদযাপিত হয়।

কাদা জলে থই থই ফুলিয়া বাজার

ফুলিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন বাজারটি বর্তমানে খুব জম জমাট। সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাজারে বেচা কেনার ভিড় লেগেই থাকে। ফুলিয়ার ৬০ হাজার লোকের চাহিদা মেটায় এই বাজারটি। শুধু ফুলিয়াই নয়, পার্শ্ববর্তী হবিবপুর এবং অনেক সময় শান্তিপুরের অনেকেই ফুলিয়া বাজারে এসে বাজার করে থাকেন। কিন্তু বর্ষা হলেই বাজারটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বাজারের ভেতর জায়গায় জায়গায় যথেষ্ট জল জমে থাকে। বাজারে ঢোকার প্রধান রাস্তাটিও (রেলের লেবেল ক্রসিং থেকে স্টেশন বুকিং ঘরের কাছাকাছি) জল কাদায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে সামান্য বৃষ্টি পড়লেই। রাস্তাটি রেল কর্তৃপক্ষের জমির উপর দিয়ে গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব। বাজার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সুপার মার্কেট গড়ে উঠলেও রাস্তার ব্যাপারে নীরব। ক্রেতা সাধারণকে জল কাদার রাস্তা পেরিয়েই বাজারে ঢুকতে হয় বর্ষার দিনে। বছরের পর বছর এই একই চিত্র চলছে। লেবেল ক্রসিং থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটির হালও একই।

একটা পরিকল্পিত নিকাশী ব্যবস্থা করে কি মানুষকে এই দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই দেওয়া যায়না ? কে করবে বাজার কর্তৃপক্ষ না রেল কর্তৃপক্ষ ?

মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার নিয়ে ডেপুটেশন

কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তে ফুলিয়া থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সেন্টার উঠে যেতে বসেছিল এবারে। পরে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের তৎপরতা এবং জেলা শাসকের হস্তক্ষেপের ফলে পরীক্ষার্থীরা নিজস্ব সেন্টারেই পরীক্ষা দিতে পেরেছেন।

ফুলিয়ায় বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি। গত ১৯৮৫ সালে এখানে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টারটি শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন পায় এবং সেই থেকে ফুলিয়ার এই ৪টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ফুলিয়ার সেন্টারে পরীক্ষা দিয়ে আসছেন। মেয়েদের সিট পড়ে ছেলেদের স্কুলে এবং ছেলেদের মেয়েদের স্কুলে। তার আগে তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হত শান্তিপুরে। শান্তিপুর যদিও ফুলিয়া থেকে ৬/৭ কি. মি. দূরত্বে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অসুবিধায় পড়তে হতো। সে কথা ভেবেই ফুলিয়ায় সেন্টার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষা শুরুর ঠিক মুখে সেন্টার তুলে নেওয়ার খবর শোনা মাত্র পরীক্ষার্থীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, অভিভাবক এবং স্থানীয় নাগরিকরাও ছাত্রদের প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারাও স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন

দেন। পরে রানাঘাট মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে কেন্দ্রটিতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় নির্দিষ্ট দিনে।

ছাত্র এবং অভিভাবকদের দাবী কোন অজুহাতেই ফুলিয়ার সেন্টারটি তুলে নেওয়া চলবেনা।

চাপড়ায় বিদ্যুৎ পর্ষদের নতুন সাবস্টেশন

গত ৬ মে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মাননীয় প্রবীর সেনগুপ্ত নদীয়া জেলার চাপড়ায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক নির্মিত একটি ৩৩/১১ কে.ভি. শক্তি সম্পন্ন সাব স্টেশনের উদ্বোধন করেন। এই নতুন সাব স্টেশনটি চালু হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন, কৃষি কাজের উন্নতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই অঞ্চলের দরিদ্র গ্রামবাসীদের লোকদীপ প্রকল্পে এ বছরেই যাতে পাঁচশটি ঘরে আলো দেওয়া হয় পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে তিনি নির্দেশ দেবেন বলে জানান। তবে বিদ্যুৎ চুরি যাতে না হয় সেদিকে গ্রামবাসীদেরকেও নজর রাখতে হবে বলেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছাড়াও জেলা সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচি, স্থানীয় বিধায়ক এবং পর্ষদের উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গৃহপালিত পশুদের মধ্যে পা ও মুখের রোগ ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা

রাজ্যের কয়েকটি জেলায় গৃহপালিত পশুদের মধ্যে পা ও মুখের রোগ (এ শো) দেখা গেছে। রোগটি ভাইরাস ঘটিত

আর খুব দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা যে শুধু পশু বা পশুর রক্ষনাবেক্ষণকারীর মাধ্যমে ছড়ায় তা নয়, বাতাসেও ছড়ায়।

পশুর মালিকদের আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়ার জন্য তাদের কাছাকাছি পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা পশু স্বাস্থ্য সহায়ক কেন্দ্র পশু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে সমস্ত সুস্থ পশুদের এই রোগের টিকা দেওয়া দরকার। রাজ্য সরকার রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পশু উন্নয়ন সহায়ক কেন্দ্রগুলিতে কম দামে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

পশু মালিকদের ক্ষুগ্ন পা ও মুখের ব্যাধিতে আক্রান্ত পশুদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাগুলো নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১। সু-সিদ্ধ ভাত, ভাতের মণ্ড, আটার ভূষি এ সমস্ত সহজ পাচ্য খাবার খেতে দিতে হবে।

২। দেহের আক্রান্ত স্থানগুলি যেমন পা, মুখের ভিতর, খুর, খুরের মধ্যেকার অংশগুলো পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়া আর ফিটকিরি জলে গুলে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন

৩। মাছি প্রভৃতির দ্বারা সংক্রমণ এড়াতে পাশের আক্রান্ত অংশগুলোতে লোশন ব্যবহার করতে হবে।

৪। গোয়াল পরিস্কার রাখা, সম্ভব হলে মেঝে চুন, ব্লিচিং পাউডার, এমন কি সোডা দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৫। জল কাদার মধ্যে পশুগুলিকে না রাখাই বাঞ্ছনীয়।

মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদে সম্মেলন

গত ২ এপ্রিল ৯০ বহরমপুর শহরের গ্রান্টহেল মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদ আয়োজিত সারা দিন ব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় শ' দেড়েক লেখক কবি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন শুরু হয় সকাল ৮ টায় শেষ হয় রাত ৯টায়। অনুষ্ঠান টিকে দু'টো ভাগে ভাগ করেন উদ্যোক্তারা। সকলের অধিবেশনটি রামেন্দ্র সুন্দর মঞ্চ এবং বিকেলেরটি মুকুন্দরাম মঞ্চ হিসাবে ঘোষিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংসদ সভাপতি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের দুই সাহিত্য সাধকের নামে মঞ্চ দুটি দুই অঞ্চলের মৈত্রী বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে বলেই তাঁদের ধারণা। ১৯৮৪ সালের এই দিনটিতেই উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের সাহিত্য জগতে এক মিলন সাঁকো গড়ে উঠেছিল। তারই স্মরণে আজকের এই অনুষ্ঠান।

সবারে করি আহ্বান। গানের সুর ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি জি, সং, মূর্মু এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি ও জেলা জজের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরই দিলীপ রায় চৌধুরীর পরিচালনায় শুরু হয় গল্প-কবিতা পাঠের আসর।

জেলার এক তরুণ কবি প্রথমেই কবিতা পাঠ করতে মঞ্চে উঠে শোনালেন তাঁর লেখা 'প্রথিত প্রত্যয়' কবিতা খানি। এখনও কানে বাজছে তাঁর কবিতার দু'টো লাইন—

বিশ্বাস বলতে শুধু মাকে বুঝি /
সব কিছুর উর্দ্ধে এক বিশাল আকাশ।

এছাড়াও কবিতা শোনালেন নাজেম হাজরা খয়রুল বাশার, বিপদভঞ্জন সরকার তরুণ তপন বসু কিশোরীরঞ্জন দাস সরফরাজ আলী। শ্যামল সরকারের কলকাতা ৩০০, মোহিনী-মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও সাধন কুমার রক্ষিতের যথাক্রমে পুরু-লিয়া ও মুর্সিদাবাদ জেলার অঞ্চলিক ভাষায় লেখা কবিতা ধরা-পতি শিকারীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখা কাব্য বিপদভঞ্জন সরকারের সায়েরী ধর্মী কবিতা, ক্ষ্যাপচাঁদের 'শুভ দিন আসছে' কবিতা উপস্থিত শ্রোতারা উপভোগ করেছেন।

এছাড়াও কার্তিক মোদক, বলরাম রায়চৌধুরী, জয়নাল আবেদিন, গোবিন্দ ত্রিবেদী, আনোয়ার হোসেন, রেবা হাজরা, আবন্তি হাজরা কুনাল কান্তি দের কবিতা ও গল্প পাঠ অনেককেই মুগ্ধ করেছে।

প্রৌঢ় বয়েসী কবি সরোজ কুমার দাস মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন— তুমি ডাকলে আমিও যেতে পারি / আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই / আমি নখ দন্তহীন এক শিশু /

এরই মাঝে যুথিকা চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা কুণ্ডু, ক্রান্তি লাহিড়ী, কাবেরী ব্যানার্জীর গান শ্রোতাদের ভিন্ন স্বাদ যুগিয়েছে গল্প কবিতার ফাঁকে ফাঁকে।

জেলার বহু লেখক কবি ছাড়াও কলকাতা, নদীয়া, হুগলী, বীরভূম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার থেকে বহু লেখক কবি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদ এরকম একটি অনুষ্ঠান করে পারস্পরিক ভাবে বিনিময় ও বন্ধুত্বের সাঁকে গড়ার কাজটি করে দিলেন। সংসদের অভিথি অপ্যায়ণও মনে রাখবার মত।

—x—

ফুলিয়ায় চুরির প্রকোপ বেড়েছে

সম্প্রতি ফুলিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে চুরির প্রকোপ বেড়েছে। গত ২২. ৫ ৯০ ও ৪ ৫. ৯০ গভীর রাতে নতুন বৈঁচা গ্রামে দুই বাড়িতে সিঁদ কেটে এবং গ্রীলের দরজার তালা ভেঙ্গে চুরি হয়। বেশ কিছু জিনিস খোয়া যায় বলে জানা গেছে।

উৎকৃষ্ট টাঙ্গাইল শাড়ীর জন্য আমাদের
শো রুমে আসুন

আমাদের নিজস্ব শিল্পীদের হাতে তৈরী ঐতিহ্যময় টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটুক।
সুতী, সিল্ক, বেনারসী, সিফন শাড়ীর প্রচুর স্টক।

৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর বাসস্ট্যাণ্ডের গায়েই
আমাদের প্রতিষ্ঠান।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননীগোপাল দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া

ফোন : ফুলিয়া-৩৮/৩৯, কলকাতা ৪২-৮৩৮৭

প্রকাশিত হয়েছে—

কাকলি ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ

এক আঁজলা সুখের খোঁজে

দাম : পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : সাহিত্য সৈকত প্রকাশনী, সৈকত সরণী
ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২

।। শিক্ষিকা চাই ।।

নিবেদিতা শিক্ষা মন্দিরের জন্য কতিপয় শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

১। প্রধান শিক্ষিকা এম. এ./এম. এস. সি (বি. টি. অগ্রগণ্য

২। বি. এ —মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী পড়াইবার দক্ষতা থাক চাই। ইংরাজী অনার্স/বি. টি অগ্রগণ্য।

৩। বি. এস. সি.—(পিওর সাইন্স)

নিম্নলিখিত ঠিকানায় আগামী ৩০শে জুন ১৯৯০ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে—

সম্পাদক

নিবেদিতা শিক্ষামন্দির

ফুলিয়া কলোনী

নদীয়া, পিন-৭৪১৪০২

হেমন্ত

শৈলেন্দ্র হালদার

সারা বছর একটিই ঋতু
হেমন্ত সে হেমন্ত,
কান্না হাসির ভুবন ডাঙায়
নেই গো ঋতু এমন তো!
সেই হামলিনের বাঁশিওলা
সেই যে রাণার দুরন্ত,
হৃদয় জুড়ে সুরের মায়া
যার ছিল অ-ফুরন্ত!
সেই যাদুতে প্রাণ ভরিয়ে
ছড়িয়ে আছেন তেমন তো,
লক্ষজনের লক্ষ গো প্রণাম
সুরের রাজা হেমন্ত!

আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সামগ্রী কাছে দূরের বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান

আধুনিক ব্যবসার জগতে, যে ব্যবসাই আপনি করুন না কেন তার প্রচার চাই. নইলে বহু প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের স্থান করে নেওয়া কঠিন।

আমরা আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আপনার স্থায়ী সম্পদ হিসাবে।

"সাহিত্য সৈকত" কে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম করুন। **"সাহিত্য সৈকত"**-এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে বহু মানুষের দরবারে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিজ্ঞাপনজনিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ—

গণেশ রায়, **সার্কুলেশন ম্যানেজার**

'সাহিত্য সৈকত'

সম্পাদকীয়

না, আর যুদ্ধ নয়

বেশ কিছুদিন ধরে দেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে একটা উত্তপ্ত হাওয়া বইছে। এই হাওয়া গোটা দেশের মানুষের গায়েই কম বেশি লাগছে। হাওয়াটা যুদ্ধের। প্রসঙ্গ : কাশ্মীর। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটা রাজ্য। দেশের পশ্চিম সীমান্তবর্তী মনোরম শৈল শহর। কাশ্মীরের অপর নাম ভূস্বর্গ. এই ভূস্বর্গের প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থানের লোভটা কতদিনের। এর আগেও কাশ্মীরকে নিয়ে জল ঘোলা হয়েছে প্রচুর। যুদ্ধের রব উঠেছে এর আগেও কয়েকবার। কাশ্মীর প্রসঙ্গে সিমলা চুক্তি মেনেই চলছিল ভারত পাকিস্থান এতকাল। সম্প্রতি কাশ্মীরের একটি জনগোষ্ঠীর বিরোধী মনোভাব এবং পাকিস্থানের উস্কানি যুদ্ধকে স্বাগত জানাচ্ছে। খণ্ড যুদ্ধ তো বেশ কিছুদিন ধরে লেগেই আছে। ধিকিধিকি করে জ্বলছিল যে রোষ তা এবারে প্রকাশ্য ময়দানে এসে ফেটে পড়েছে। রোষের দাবানল যদি যুক্তি তর্কের নিরিখে মেটে তো ভালোই নয়তো যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনাই বেশি। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীও বীরত্বের ঘোষণাতেই সোচ্চার। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো বলেছেন—হাজার বছর ধরে চলুক এ যুদ্ধ। আমাদের রাজা সাহেব অবশ্য গোঁফের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলেছেন পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ যদি বাধে তো সাত দিনই যথেষ্ট। এক সোমবারে যুদ্ধ শুরু হলে তার এক রবিবারের মধ্যেই শেষ।

যুদ্ধের রসদ যার যাই-ই থাকুক না কেন, যুদ্ধ বাধলে তার জয় পরাজয় যাই ঘটুক না কেন যুদ্ধের যে পরিণাম তা ভয়ঙ্কর ভয়াবহ। যুদ্ধ হিরোশিমা ও নাগাসাকির কথা মনে করিয়ে দেয় আমাদের। তাই, না আর যুদ্ধ নয়, পৃথিবীর কোথাও না।

SAHITYA SAIKAT
Apr.-June, 1990
Regd. No. 42112/81 R. N. I.
Rs. 2·00

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন

বিয়ের কনেকে সাজাতে
এখন আর বেনারস যেতে হবে না
আমাদের কাছেই পাবেন
কনে সাজানর টাঙ্গাইল বেনারসী।

আসুন সপরিবারে আমাদের **সমবায় সদন**-এ
ফুলিয়া রেল স্টেশনের কাছেই।

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প
সমবায় সমিতি লিঃ
টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

ফুলিয়া, নদীয়া। দূরভাষ : ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া নদীয়া ৭৪১১৪০২
মুদ্রণ : মায়াপ্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উত্তর)

সাহিত্য পত্রিকা

বর্ষ ১ □ সংখ্যা ৪ □ জুলাই-সেপ্টেঃ ১৯৯০

এ সংখ্যার সূচি

ছোট গল্পের সংকট	: নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৫
সোনালী শরৎ আমার কবিতা	: বন্দেআলী মিয়া	৭
কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	: কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	৯
কবি করুণানিধানের কথা	: গৌর পাল	২০
মৃত্যুর মুহূর্তে জীবনের আলোয় এক নিঃসঙ্গ কবি	: তৃপ্তি রায়	২২
কবি করুণানিধান প্রসঙ্গে	: বিনায়ক সান্যাল	২৪
কবি করুণানিধান	: ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৭
কবি করুণানিধান	: ধীরানন্দ রায়	২৮

পুজোয় চাই
এ. টি. জুয়েলার্সের
গয়না

অলংকার শিল্পে ফুলিয়ার
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

কম সোনায় আধুনিক ডিজাইনের মজবুত গয়না পেতে হলে আসুন আপনাদের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান **এ টি. জুয়েলার্সে**।

এ. টি. জুয়েলার্সের জড়োয়া এবং রুপোর অলংকার ও শিল্প নৈপুণ্যে আভিজাত্যের চিহ্নবহ।

সকলকে পুজোর নিমন্ত্রণ।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া।

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার সম্পূর্ণ দিন বন্ধ।

Scheme for providing Self-Employment to Educated Unemployed Youth

Eligible persons interested in availing of assistance under the scheme for self employ ment through setting up of Industry/Service/Business ventures with the aid of Financial Assi tance as loan not exceeding Rs. 35000/- for industry Rs 25000/- for service and Rs. 15000/- fo Business, from banks, are hereby requested to apply in prescribed form in duplicate availab fr m the office of the respective General Manager, District Industries Centre and Extension Offic , Industries) of respective Block on or before 20-8-90 the concerned General Manager, Distri Industries Centre of the District. The envelop containing the application should be superscribe "Application for the SEEUY during 1990-91"

Eligibility Criteria :

A) **Qualification** : Matriculation (Class X pass) and above I.T.I. passed youths will b eligible to apply for setting up industrial and service ventures also.

B) Age : 18 to 35 years as on date of application)

C) Employment status : Must be unemployed & registered with Employment Exchange on o before the date of application.

D) Economic Status : Income of maximum Rs. 10,000/- per family per annum F include parents, brothers, sisters of the applicant an

be taken to compute family income.

E) Reservation : Minimum 30% of the cases will be resreved for Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

F) Coverage : Whole of West Bengal excluding Calcutta Corporation areas

Enclosures to the applications :

1) Attested/Xerox copies of certificates of qualification.
2) Attested/Xerox copies of certificate of age.
3) Attested/Xerox copies of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate where applicable.
4) Attested/Xerox copies of Employment Exchange Card.
5) Attested/Xerox copies of affidavit in the form furnished in application form
6) Copy of scheme.

N. B. 1) Preference will be given to scheme of Industries.
2) Women & Technically qualified candidates will be given weightage,
3) Incomplete applications will be rejected
4) Application is to submitted in duplicate with all enclosures in the office of General Manager, D I C. Nadia.

Adv. No. 11/90-91 D. I & C O. Nadia Dated 3-8-90

সম্পাদকীয়

ছেঁড়া ঝোলায় সম্পদ

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'সাহিত্য সৈকত' এর ন'বছর বয়েস পূর্ণ হলো। দশ বছরে পা রাখল সে।

ন'বছর পূর্ণের মুহূর্তে আমরা একটু অতীতমুখো হয়েছি। ছেঁড়া ঝোলায় পড়েছিল অনেকদিন আগেকার রচিত বহু জনের অমূল্য কিছু সম্পদ। সময়মত তাঁদের লেখাগুলো ছাপা যায়নি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন প্রয়াতও হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য ছোট গল্পকার নরেন্দ্র নাথ মিত্র, প্রাবন্ধিক কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও বিনায়ক সান্যাল, প্রথিতযশা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। জীবদ্দশায় এই পত্রিকার সঙ্গে এঁদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ঝোলা হাতড়িয়ে পাওয়া তাঁদের কয়েকটি রচনা বিলম্বে হলেও হুবহু ছাপা হলো। দু'টি লেখার পুণর্মুদ্রণও ঘটেছে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ও গুরুত্ব বুঝে।

প্রসঙ্গত বলি কবি করুণানিধান শতবর্ষের আঁয়ু রেখা অতিক্রান্ত করার পরও এক যুগ অতিবাহিত করেছেন কিন্তু এখনও তাঁর স্পর্শ অনুভব করি আমরা। আজও কানে এসে বাজে তাঁর লেখা কবিতার কত কথা কত সুর। যেমন—

'কতনা অতীত চিতায় পুড়িয়া
চিহ্নহারা
পরপারে কারা মৌন ভাষায়
দেয় গো সাড়া।'

—সব অতীতই কি চিহ্নহারা? চিতার আগুনে পুড়লেই কী সব নিঃশেষ! আমাদের তা মনে হয়না, অন্তত: করুণানিধানের ক্ষেত্রে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অপ্রকাশিত রচনা—ছোট গল্পের সঙ্কট

["ছোট গল্পের সঙ্কট" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি অভিভাষণের অংশ বিশেষ। ১৮/২/৭৩ রচনাটি লিখিত এবং এযাবৎ অপ্রকাশিত। রচনাটি তদীয় পত্নী শ্রীমতী শোভনা মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক]

ছোটগল্প কাকে বলে, তার স্বরূপ কী-তা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যাক—

"ছোট সুখ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দু চারটি অশ্রুজল
নাহি কল্পনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্ত রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

অবশ্য ছোটগল্প সম্বন্ধে এও শেষ কথা নয়। কোন সংজ্ঞা দিয়ে কি বর্ণনা দিয়ে একটি বিশেষ শিল্পরূপকে আগাগোড়া বাঁধা যায় না, বোঝানোও যায় না। তবে বস্তুটি কী তার মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া যায় বই কি। এই মুহূর্তে যে কথা আমার বড় বেশি করে মনে পড়ছে তা তার রূপতত্ত্ব ইতিবৃত্ত শ্রেণীভেদ কি কুলপঞ্জীর কথা নয়, তার সঙ্কটের কথা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির বড় একটি অংশে আছে গীতিকবিতা আর ছোটগল্প, অন্তত গত চার পাঁচ দশকের ইতিহাস তাই। এখানকার বেশির ভাগ লেখকেরই ছোট গল্পের মেজাজ। তাঁদের হাত ছোট গল্পে যেমন খোলে বড় রচনায় তত নয়। ব্যতিক্রম দু'-চারজন নিশ্চয়ই আছেন। তাঁরা অবশ্যই সংখ্যায় গরিষ্ঠ নয়।

যে দেশের যে ফসল। ছোট গল্পের এই বিশেষ ফস[illegible] ইদানীং অনাদৃত আর অবজ্ঞাত হয়ে উঠেছে। গল্প মাসি[illegible] সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রপত্রিকায় বেরোলি। কিন্তু বই হয়ে বেরোয় খুব কম। নবীন প্রবীন সব লেখকের পক্ষেই গল্পের বই বের করা দুরূহ। প্রকাশকরা বলেন গল্পের বই বিক্রি হয় না। ছেপে কী হবে? তাঁকেও তো গুদাম ভাড়া দিতে হয়।

ছোট গল্পের সঙ্কলন বিয়ের উপহার হিসেবে চলে না। সাধারণ পাঠাগারের সেক্রেটারীরা সেগুলি কেনেন না। কারণ তার পাঠক নেই, পাঠিকাতো নাকি একেবারেই নেই। অথচ শোনা যায় ম্যাগাজিনে তাঁরা গল্প পড়তে ভালোবাসেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে ছোট গল্পের সঙ্কলন তাঁরা ধার নিতে চান না। বড় উপন্যাস বৃহদায়তন উপন্যাসই তাঁদের পছন্দ। যাতে অনেক সময় কাটে। যা অনেকক্ষণ ধরে পড়া যায়।

এই তো গেল ব্যবসায়িক দিক। মর্যাদার দিকেও ছোটগল্প একান্তই খাটো হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের জন্যে রাজ্যে আর কেন্দ্রে যে সব সরকারী পুরস্কার আছে তা কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন গল্প সঙ্কলনকে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু ছোটগল্প সাহিত্যের অন্যান্য রূপকল্পের তুলনায় বয়সে নবীন হলেও সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে সর্ব দেশের সাহিত্যে স্বীকৃত। আমার দেশেও নিশ্চয়ই তাই। সাহিত্যের একটি রূপকল্পের সঙ্গে আর একটি রূপকল্পের তো কোন বিরোধ নেই। তাদের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই। সবগুলি শাখা পুষ্পিত এবং ফলবন্ত হলে তবেই মুল বৃক্ষটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ছোট গল্পের মান যাতে উন্নত হয় তার অনুশীলন যাতে বাড়ে তার দায়িত্ব লেখক পাঠক প্রকাশক তিন পক্ষেরই আছে। সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বন্দে আলী মিয়ার দু'টি কবিতা

সোনালি শরৎ

শরতের মধু নিশি এসেছে ফিরে
তুমি আজ ও আসিলেনা হায়
কাননের ফুল তাই নীরবে ঝরে
নভে চাঁদ চাহে গো বিদায়।
মনের গহণ কোণে একটুকু আশা
দুইটি নয়নে তার না-বলা যে ভাষা
সোনায় হরিণ যে গো গেছে হারিয়ে
পথ তার বারে বারে চায়।

জীবনের কেটে যায় মাধবী প্রহর
কেটে যায় পুষ্পিত দিন
আকাশে বাতাসে জাগে মদির পরশ
চোখে জাগে প্রভাত নবীন।
তুমি কি ভুলেছো প্রিয় ফেলে আসা পথ
আবার এসেছে ফিরে সোনালি শরৎ
মনের ময়ূর মোর এমন বেলায়
পাখা মেলে কোথা উড়ে যায়।

আমার কবিতা

এখনো জ্বলিছে সূর্য আকাশের দূর আঙিনায়
ভাসিয়া আসিছে আজও ঝর্ণার উচ্ছল ধ্বনি,
কাকলী মুখর দিন—দিকে দিকে চলে উৎসব
এখনো নামেনি ছায়া দিগন্তের নির্জন সীমায়।

আমার সাগর তীরে আসিয়াছে মৎস্য কুমারী
এসেছে সিন্ধু বিহগ—অগণিত কলহংস দল,
অযুত তরঙ্গ নাচে নভ তলে মেলি শত ফণা
দক্ষিণ প্রান্তর ভরি আসিয়াছে পুষ্প আবেদন।

জোয়ার এসেছে তাই হৃদয়ের দুকূল ভরিয়া
তবুও কংকাবতী মেলিলো না দুইটি নয়ন!
সোনালি পরশ মোর লাগেনি কি তাহার তনুতে
জাগেনি যৌবন দিন পরিপূর্ণ মানস দুয়ারে!!

আমার কবিতা কিগো ঠাঁই নাহি পেলো তব মনে
আমার গানের সুর কেঁদে ফিরে গেল আজি হায়,
শোনো গো কংকাবতী মনে আজ লেগেছে যে রঙ
উদেছে নবীন সূর্য আমাদের ভুবন ভরিয়া।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দু'একজন স্বল্প লেখক কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫ খৃঃ) ব্যতিরেকে,-কবি করুণানিধান রবীন্দ্রভক্ত প্রখ্যাত পুরুষ কবিদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার জন্মস্থান শান্তিপুর (নদীয়া —তারিখ ইং ১৯।১১।১৮৭৭ খৃঃ ; মৃত্যু হয় ইং ৫।২।১৯৫৫ খৃঃ।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, কবি কুমুদ রঞ্জন, সত্যেন্দ্র দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, শৌরীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুশীল দে প্রভৃতি কবিদের সকলেরই জন্ম ১৮৮২ গতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

এই বৎসর কবি করুণানিধানের জন্ম শতাব্দী পূর্ণ হবে। কবির জীবন ঘটনাবহুল নয়, —১৯০২ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করে * স্কুলের শিক্ষকতা করেন। কাব্যলক্ষ্মী শৈশবেই তাঁকে প্রভাবিত করেন, —তাঁর দেশপ্রেমাত্মক প্রথম কাব্য বঙ্গমঙ্গল (১৩০৮ বিনানামেই ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রসাদী (১৩১১) ঝরাফুল (১৩১৮) ধানদূর্ব্বা (১৩২৮) শান্তিজল (১৩২০) শতনরী (১৩৩৭ রবীন্দ্র আরতি (১৩৪৪), ভগবদগীতায় উপদিষ্ট অংশ বিশেষের কাব্য রূপায়ণ 'গীতায়ণ' নামে প্রকাশিত হয় জন্মাষ্টমী ১৩৫৬ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ হইতে। এটী উৎসর্গ করেন আমার আত্মীয় এবং অগ্রজ বন্ধু কবিরাজ জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্নকে।

১৯৫১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'জগত্তারিণী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'শেষ পসরা' ও 'চিত্রায়ণী'। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'গীতারঞ্জন' প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ (১৯৫১ খৃঃ) সালে।

'শতনরী তার কাব্যগ্রন্থাবলীর চয়নিকা, তার প্রথম সম্পাদনা করেন কবি হেমচন্দ্র বাগচী ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে।

* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনি হ'তে পারেননি —সম্পাদক

এই সঙ্কলনটি কবি করুণানিধান উৎসর্গ করেন তাঁহার কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬৯ খৃঃ—১৯২৯ খৃঃ) —ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র এবং সৌমেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন। উৎসর্গের প্রথম পংক্তি—'নমি তোমা কবি ঋষি বরণীয় অন্তরঙ্গ মোর' উভয় কবির অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। কবি সুধীন্দ্রনাথ কবি'খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বৈতানিক', 'দোলা'-প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কবি করুণানিধানের 'প্রসাদী' গ্রন্থখানি পড়ে মুগ্ধ হয়ে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির পরিচয় করে দেন।

শতনরীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন কবিশেখর কালিদাস রায় ১৩৫৫ (১৯৪৮ খৃঃ) সালে এবং কবিকে সংবর্ধনা দেওয়ার উপলক্ষে রচিত 'সন্ধ্যারতি' কবিতাটি গ্রন্থারম্ভেই উদ্ধৃত করেন।

কবিতাটীতে মোহিতলাল কবিকে অগ্রজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে বলেছেন—

"সন্ধ্যা হয়ে এল কবি!
তুমি আগে আমি তব পিছে, চলেছিনু সেই পথে
আজি এই দিবসান্তে মনে হয় ... ...
সুন্দরের সামগান শুনেছিনু তব কণ্ঠে কবি
সেই মন্ত্রে যৌবনের সোমরস,—এক মাত্র হবি,
ঢেলেছিনু বাণী যজ্ঞে ... ...
আজও তুমি আগে আগে আমি তব পিছে চলিয়াছি
এবারের যাত্রাপথে হারাবো না পদচিহ্ন তব
আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি
রূপে যার একদিন রচিতাম স্বপ্ন নব নব।
আপনি লইতে কণ্ঠে সে মালিকা তুমি প্রীতিভরে
ফুল মোর বড় হয়ে ফুটিত সে তোমার আদরে।"

করুণানিধান তীর্থে এবং সাধু-সঙ্গে বিশ্বাসী, পরমভক্ত ধর্মপরায়ণ, শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং স্বদেশ বৎসল কবি ছিলেন।

তাই মোহিতলাল ঐ কাবতাতেই বলেছেন :—

"হরিদ্বার কনখলে পিপাসার করিলে তর্পণ
কারে স্মরি মঠে মঠে লুটাইয়া করিলে ক্রন্দন ?
নীলাচলে কি হেরিলে, সে অকূল বারিধি-বাসরে
দারুব্রহ্মে প্রণমিয়া কোন বর মাগিলে কাতরে ?
"কাতর ? তোমারে কবি কোন বিধি করিবে কাতর ?

* * *

সুন্দরের পাণিস্পর্শে মিলায় সে নিমেষের ক্ষত
ক্রন্দন ভুলিয়া যাও বাঁশি পেয়ে; বালকের মত
ডাকে তোমা বন গিরি নদী মেঘ জলধি অম্বর
ডাকে কাননের পাখী কাঁদিবার কোথা অবসর ?
"আমার বন্দনা লহ, লহ মোর প্রাণের প্রণাম

* * *

কত না করিনু সাধ উচ্ছ্বসিয়া গাহি তব নাম।"

কবিতাটীতে কবির ছবি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। কবি প্রকৃতিতে 'সুন্দরের পাণিস্পর্শ, পুরুষোত্তমের আনন্দময় প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন,—শ্রুতির ভাষায় "আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।"

কবির স্বভাব এবং অমায়িক সরলতা ছিল বালকের মতই একান্ত সরল অকপট এবং অকৃত্রিম। বর্তমান যুগের সভ্যসমাজের ব্যবহার-বাহুল্য বা কথার আড়ম্বর তাঁর মোটেই ছিলনা। তিনি যেন সরল পল্লীসমাজের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় ভগবদুপাসনায় নিমগ্ন থাকেন। বহুদিন যাবৎ তাঁর গ্রন্থগুলি অপ্রাপ্য হওয়ায় এবং সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা বা সমালোচনা প্রকাশ না হওয়ায় বর্তমান যুগের পাঠক সমাজে তিনি বিস্মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। সেজন্য ৩ বৎসর পূর্বে ১৩৮১ (১৯৭৪ খৃঃ) সালে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন কুমার ৬৫৮

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থে কবির জীবন ও কাব্য গভীর গবেষণা সহকারে বহুতত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করলেন তখন কোন কোন অধ্যাপককে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুনেছি পরিহাস করতেও শুনেছি যে এই ব্যয় বহুল শ্রমসাধ্য আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অপরিমিত হয়ে পড়েছে। যে কেহ যত্ন করে পড়লেই দেখবেন যে সমসাময়িক কালের সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক বিবরণে এবং কবি করুণানিধানের কাব্য প্রতিভার ছন্দ ভাব রূপ ও রসমাধুর্যের বিশ্লেষণে, গ্রন্থখানিতে সাহিত্যের ইতিহাসে কি অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। মনে হয় কবির শত বার্ষিক স্মরণোৎসবে এই গ্রন্থখানিই, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য বা সুযোগ্য উপঢৌকন বলে স্বীকৃত হবে।

কবি নিজে একান্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন ও নীরবে নিভৃতে কাব্যসাধনা করে গিয়েছেন, কখনও মঞ্চে উঠে জনতার সম্মুখীন হননি, কোনো সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা কোনো পত্র পত্রিকা সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তাই তাঁকে লোকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। তাঁর প্রসঙ্গে মনে হয়ঃ—

"আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
আপনারে তুমি গোপন করিয়া রাখো
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।"—রবীন্দ্রনাথ।

তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৭ই মাঘ ১৩৫৬, তখন কবি জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভক্ত এবং শিষ্য ছিলেন। তাহার পর তিনি আর ৫ বৎসর ছিলেন মাত্র। তাঁকে বলা হয়েছে "হে প্রকৃতির সরল শিশু নাও হৃদয়ের অর্ঘ্যভার" (কবি বিজন কুমার চট্টোপাধ্যায়) এ তাঁর শিশু সুলভ প্রকৃতির হুবহু বর্ণনা।

তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, অন্ধ ভাবে তাঁর হাত ধরে ধরে চলেননি। তাঁর রচনাশৈলী পৃথক স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। তিনি প্রকৃতির বাউলছেলে, রূপে রহস্যে সুরে এবং স্বপ্নে বিভোর হয়ে ধ্যানাবিষ্ট চোখে তিনি যা দেখেছেন তাই

করেছেন। সজনী কান্তের ভাষায়,—

'অর্ণব পর্বত সর্পিল মেঠোপথ তরল তটিনী মহারণ্য
বন্দনা গানে তব রূপ নিল অভিনব, হে রূপরসিক তুমি ধন্য।'

তিনি সারস্বত কুঞ্জের কবি বাউল, আধি ব্যাধি ভরা শোক তাপ জরাজর্জর জগতের দুর্ভোগ যন্ত্রণা ও বিচিত্র বিড়ম্বনা তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পায়নি। তাই কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন,—

"তোমাকে বন্ধু চিনেনিকো তব বঙ্গভূমি
দেশের লোকের মন জোগাতে তো লেখোনি তুমি। ···
"প্রাণের বারতা পায়নি এদেশে তোমার গানে
কবিদের কবি! তোমারে শুধুই কবিরা জানে।" ···
"স্বপ্ন ভুবনে নিয়ে গেছো তুমি স্বপ্ন কবি
কল্পনা দিয়ে রচিয়াছো তুমি নূতন ছবি।"

কবিশেখর বলেছেন যে কবির "এই কাব্যলোক স্বরাতপ্ত জরাশপ্ত আধিব্যাধিময় দুঃখ ক্লেশ ভরা বাস্তব জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার আশ্রয় সমস্ত তাপ জ্বালা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের আশ্রম।" "ইহাদের রচনা রীতির পরম্পরা বা অনুক্রম যুক্তিগর্ভনয়, আবেগাত্মক নয়, বক্রোক্তি মূলক নয়, ইহাদের অনুক্রম স্বপ্ন বিলাসেরই অনুবর্তী স্বপ্ন মাধুরীই ইহাদের স্থায়ীভাব।"

কবি করুণানিধান তন্দ্রা তন্ময়, ভাব বিহবল, আত্মভোলা কবি। প্রকৃতির দুলাল যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তার ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে খোশখরচী বালক দিলদরিয়া মেজাজে তাঁর ইয়ার বন্ধুদের দু'হাতে বিলিয়ে দিতে একেবারে পথের পথিক হয়ে তীর্থঙ্কর হয়ে তীর্থ তীর্থে মাধুকরী বৃত্তি করে বেড়িয়েছেন—যেন।

"সবঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় তারে আমি লব চিনিয়া।"

কবির শেষ জীবনে কবিগুরুর এই বাণীই সত্য হয়ে উঠেছিল।

কবি দারিদ্র্যে ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিত্ত ছিল সমৃদ্ধ, — কোনো অভাব অনুযোগ অভিযোগ ক্ষোভ বা লোভ ছিল না।

তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর গৃহে অতিথি সমাগমও হত প্রচুর তাদের জন্য তিনি বিস্কুট আনিয়া রেখে দিতেন এবং তাই দিয়ে সকলকে মধুর বিনয়ে আপ্যায়িত করতেন। এমন উদার অমায়িক মানব প্রেমিক সরল সুন্দর প্রকৃতির কবিকে সহায় সম্বলহীন বিপত্নীক জীবনে কি অভাব ও অবহেলায় জীবন যাপন করতে হয়েছে তা মনে করে আজ সকলেই দুঃখ ও লজ্জাবোধ করবেন। কবির মৃত্যু হলে আমরা তাঁর চিতায় মঠ দেউল নির্মাণ করে যেন প্রায়শ্চিত্ত করে থাকি একথা ভাওয়ালের দরিদ্র কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস ক্ষুব্ধ চিত্তে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে গেছেন। কবি করুণানিধান ছিলেন নির্বিকার সদানন্দ পুরুষ এবং সে হিসাবে তিনি প্রাচীন ঋষিদের সংজ্ঞায় পণ্ডিত পদবাচ্য অধ্যাত্ম সম্পদে ধনী এবং গীতার ভাষায় অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।' যিনি,—

লব্ধ্বাব্যানেব লভতে গন্তব্যানেব গচ্ছতি
প্রাপ্তব্যানেব চাপ্নোতি দুঃখানি চ সুখানি চ।

'তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব'— এইরূপ ছিল তাঁর নিবেদিত আত্মার স্বরূপ,—তিনি সুখদুঃখ ভগবৎ চরণে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করে গেছেন সারাজীবন ধরে। আমার সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় তার শেষ জীবনে। তিনি তখন কলকাতায় এসে রয়েছেন C/o N. C. Das Gupta, P61, Central Avenue, 1st floor, suit no 2 এই ঠিকানায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরোক্ষ পরিচয় হয় পত্রের মাধ্যমে সাহিত্যসূত্রে। পরে কলিকাতায় প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় প্রথমে সাহিত্যসূত্রে পরে চিকিৎসাসূত্রে।

বৈদ্যরত্ন কবিরাজ জীবনকালী রায় আমার মাতৃ মাতুল সম্পর্কে দাদা এবং বন্ধু ছিলেন। তিনি কবির অভিন্নহৃদয় ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে অনেকদিন আত্মীয়ের মত বাস করেছেন

এবং তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়েছেন। সেই সূত্রে আমার নাম ও কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যখন কলিকাতায় উপরোক্ত ঠিকানায় আসেন তখন আমাদের 'কলিকাতা সাহিত্যিকা' থেকে সম্পাদক (তৎকালীন 'বঙ্গশ্রী'রও সহ-সম্পাদক) আমার অনুজ প্রতিম বন্ধু শ্রীমান রণজিৎ কুমার সেন তাঁকে আমন্ত্রণ করেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটী হয় চালতা-বাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর নাটমন্দিরে। আমি তখন 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' সভাপতি এবং বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্ভবতঃ গ্রন্থাগারিক বা সম্পাদক, কারণ পর পর কয়েক বৎসর আমি সম্মিলনীকে সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

ঐ সংবর্দ্ধনা সভায় তিনি সাহিত্যে কবিতার স্থান স্বরূপ ভাব রূপ রস ঐশ্বর্য মাধুর্য সম্বন্ধে অতি সরল সাবলীল ভাষায় অনতিদীর্ঘ ভাষণ দেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে নিজের কয়েকটি কবিতা ভাববিহ্বলচিত্তে ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে আবৃত্তি করে শোনান। শুনে মনে হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রার্থনা বাণী,—

"আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে."

যেন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে, কবির জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহ যন্ত্রটী যেন তার প্রতি তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে বেজে উঠেছে,— এমনই সে আবৃত্তি।

তারপরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বর, কাশি নিয়ে আরম্ভ পরে বুকে বেদনা। আমি পরীক্ষা করে দেখি যে তা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার সূত্রপাত। উদ্বিগ্ন চিত্তে ওষুধ লিখে দিলাম। পরে তাঁর বাড়ী থেকে খবর এল কবি জিদ্ ধরেছেন ওষুধ খাবেন না। আমি তো প্রমাদ গুণলাম— বিশেষ করে কবির জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহের জন্য—তাই নিজে গিয়ে তাঁকে শিশুর মত নানা প্ররোচনা বাক্যে ভুলিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাইয়ে ফিরলাম। সে যাত্রা খুব বেশী তিনি ভোগেননি তবে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সূত্রে এবং সেই সময়েই আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। আর একবার আমহার্ষ্ট

এতে আমার দাদার একটি কন্যাকে পাওয়া, ইসাবে প্রদর্শনের সময় সেখানে আমি কবি করুণানিধান, কবি শেখর কালিদাস ও কবি মোহিতলালের সঙ্গ লাভ করি। বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে শেষ জীবনে মোহিতলালের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়, প্রথমে সাহিত্য সূত্রে পরে চিকিৎসা সম্পর্কে। মোহিতলাল তাঁর 'অভয়ের কথা'র সম্পাদকের ভূমিকায় বন্ধু ভাবেই আমার সামান্য সাহায্যকে বর্ণাঢ্য বিশেষণে বাড়িয়ে বলেছেন। আমি তার জন্য কুণ্ঠিত।

ঐ দিনের সভায় উভয় কবির কবিতা আবৃত্তি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছি তা কখনও ভুলতে পারবোনা।

অতঃপর আমাকে কবি করুণানিধান যে পত্রগুলি লিখেছিলেন তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

পত্রগুলি নূতন গৃহনির্মাণ করে বাসা বদলের সময় এমন ভাবে চাপা পড়েছিল যে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। তাই শ্রীমান মদনমোহনের গ্রন্থে এগুলি মুদ্রিত হয়নি। এগুলি সবই অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে।

ওঁ

খাগরা
পোঃ মুর্শিদাবাদ
৩১শে আগষ্ট ৪৮

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

প্রিয় কালীকিঙ্কর বাবু,—

এখানে আসিয়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়া, পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তাঁহার ঔদার্য্য ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বেই পাইয়াছিলাম। এতদিনে আমাদের বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গত্বে পরিণত হইয়াছে। সকলি বিধি নির্দ্দিষ্ট।

আপনার 'মারা' আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, একথা জীবন বাবুকে জানাই তিনি বলিলেন যে আপনি তাঁহার ভাই। আপনিও আমার কবি ভ্রাতা একথা তাঁহাকে বলিয়াছি। আপনার 'শেষের গান' ও আমার ভাল লাগিয়াছে। একথা আপনাকে শান্তিপুর হইতেই লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার বই দু'খানি জীবন বাবুকে ওখানে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার রচনাও দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার বাণী সাধনা সফলা একথা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া লিখিতেছি।

যদি কখনও কলিকাতায় যাই, আপনার সহিত দেখা করিব। আপনার 'শেষের গানের' একটা কথা এখনো মনে আছে। নায়িকার মুখে 'হে দেবর'! যেখানে লিখিয়াছেন ঐ স্থানটী সাহিত্যরসে সিক্ত। কালিদাসের মেঘদূতে যেখানে যক্ষ মেঘকে ডাকিয়া বলিয়াছেন 'হে মৈঘ'! তুমি আমার বিরহে শীর্ণা দয়িতাকে এই বলিয়া সম্বোধন করিও, 'অয়ি অবিধবে'! কারণ তাহাকে ঐ একটী কথা বলিলেই তাহার আনন্দ হইবে। প্রথমেই এইরূপ সম্বোধন করিলে তাহার উদ্বেগ দূর হইবে।

আপনাকে কিছু নিবেদন করিতেছি। জীবন বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ যোগ্যা। তাহার বয়স ১৫ বৎসর, এখন সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। * * * যদি কন্যাটী আপনি দেখিতে চাহেন এখানে আসিবেন। আপনার সহিত আমারও দেখা হইবে। তবে আগামী শনিবার এখান হইতে অন্যত্র যাইতেছি। স্বাস্থ্য সাধনায় শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়াছি। জীবন বাবুর বাড়ীতে একমাস আছি। রাজভোগে আছি। তিনি কবিরাজ আর আমি কবি। কবিরাজ যদি বৃদ্ধ কবিকে না দেখিবেন তবে আর দেখিবে কে? তাঁহার পুত্র কন্যা নাতিদের সেবায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতেছি। এখন ঘরের লোক হইয়া গিয়াছি। এখান হইতে পশ্চিমে চেঞ্জে যাইব।

আশা করি পত্রোত্তর শীঘ্রই পাইব। কবিশেখর শ্রীমান কালিদাস রায়ের 'গীতা' এখনো দেখি নাই। আমার রচিত

কবিতাগুলি ছাপাইতে দিয়াছি। ২২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। কালিদাস ও মোহিতলাল ভাল কবিতাগুলি বাছিয়া দিয়াছে এবং কালিদাস গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছে। মোহিত একটী কবিতা লিখিয়াছে। আরও ৩২ পৃষ্ঠা প্রুফ্ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে আপনাকে শ্রদ্ধা উপহার পাঠাইব। অধিক আর কি লিখিব!

ভবদীয়—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁ

C/o N. C. Das Gupta,
P61, Central Avenue,
1st floor, suite no 2
27/5/1949

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান কালীকিঙ্কর

তোমার কবিতা দু'টী পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলাম, পাকা লেখা, মুন্সিয়ানা আছে। ভাষা ভাবানুসারিণী। 'নূতন স্বর্গ' নামক কবিতাটীর শেষাংশ-'স্বর্গ হইতে বিদায়ে' বেশ একটী নূতন ভাব ফুটাইয়াছো।

"কে চায় ফিরে স্বর্গ সভা
ঐ অধরের রক্তজবা"

চির যৌবনের পূর্ণ ছবি।

আশাকরি সপরিবারে কুশলে আছো। আমি সুস্থ হইলেই তোমার সহিত দেখা করিব।

ইতি তোমার শুভার্থী
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

P61, Central Avenue,
1st floor suite no 2
Calcutta
26 th June, 1949.

পরম কল্যাণীয় কবি

শ্রীমান কালীকিঙ্কর,

আমার শ্যালক শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রকে তোমার কাছে পাঠাইলাম। তাহার হাতেই এই পত্র দিলাম। সে এবার B. Sc. পড়িতেছে Physiology তে Honours লইয়া। সে সম্প্রতি (১০/১৫ দিন পূর্ব্বে) Carmichael Medical College (R. G. Kar) admission এর জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। তুমি তো অনেক Medical Institute এর সহিত সংযুক্ত আছো, পত্র বাহক আমার পুত্র স্থানীয়। সে যাহাতে Carmichael College এ ভর্ত্তি হইতে পারে, সে ব্যবস্থা তুমি ভিন্ন আর কেহ করিবে না। তোমার সুপারিশ পাইলে সে ভর্ত্তি হইতে পারিবেই আমার বিশ্বাস। ডাক্তারি পাশ করিলে সে খাইতে পরিতে পারিবে। তোমার নিকট এই উপকার ভরসা করি।

আশাকরি সপরিবারে ভালো আছো। তোমার ওখানে যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু কোমরে বেদনা আছে বলিয়া আপাততঃ যাইতে অপারগ। দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। 'শতনরী' কিরূপ লাগিল? সেদিন সংস্কৃতি সংঘে 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' অধিবেশনে তোমার ভাষণ খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। কবি শ্রীমান মোহিতলাল এখনও অসুস্থ। তুমি যদি তাহাকে দেখিতে যাও তাহা হইলে তোমার সহিত আমি যাইতে পারি। সকলি বিধি নির্দ্দিষ্ট। নূতন কবিতা কিছু লিখিয়াছো কি? কবি কুমুদ রঞ্জনের 'স্বর্ণ সন্ধ্যা' নামে কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। ঐ কাব্যে 'আনন্দ' নামে কবিতাটী অতি চমৎকার। সুবিধা মত একদিন দেখা করিও। 'কলিকাতা সাহিত্যিকার' অধিবেশনের সংবাদটী কি কোন কাগজে প্রকাশিত হইল? ইতি।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ ছেলের বাবাকেই তোমার নিকট পাঠাইলাম।

কবি করুণানিধানের কথা

গৌর পাল

সে অনেকদিন হলো। মাত্র কয়েকদিন আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। অখণ্ড অবসর। "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো"র ছকে কবিতা লেখার, অর্থাৎ দাগা বুলোনোর চেষ্টা করছি। জেঠামশাই এসে বল্লেন "রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য কবি করুণানিধান শান্তিপুরে ফিরে এসেছেন। দেখতে যাবি?" আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম "এক্ষুনি কি?"

কবি তখন দুর্গামণি পাঠশালার পাশের বাড়ীতে ছিলেন। বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে কবি একাই ছিলেন। প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর শেষ না হতেই করুণানিধান আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "সন্দেশ খাবি?" আমি লজ্জিত হয়ে বল্লাম "আমি কি ছেলেমানুষ?" তিনি সে দিকে না গিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন "সে কী! সন্দেশ খেতে ভালবাসিস নে?" আমি কবির সন্দেশের গল্প জেঠামশায়ের মুখে আগেই শুনেছিলাম। শুনে ভারী মজা লেগেছিল। কবি রোজ ছোটছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে সামনে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়াতে ভালবাসতেন মাত্র শিশুরাই মনের ভাব গোপন করতে পারে না। তাই সন্দেশ খাওয়ার অকৃত্রিম খুশী তাদের মুখেচোখে ব্যবহারে কেমন ফুটে ওঠে তা উপভোগ করতে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। আমি যে বড় হয়ে গিয়েছি সে কৈফিয়ৎ কিন্তু কবি শুনেও শুনলেন না। সে দিন শুধু সন্দেশের আস্বাদ নয়, ফুলের চেয়ে নরম এক আশ্চর্য্য মনের স্নেহের স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরেছিলাম।

তার আগেই করুণানিধানের "বঙ্গমঙ্গল" ও "শান্তিজল" পড়েছিলাম। তাঁর নিপুণ শব্দ বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করতো। আমারও উচ্চাশা ছিল তাঁর মত দক্ষ শব্দ শিল্পী হতে হবে, কবি হতে হবে। কিন্তু সেদিন সেই বয়সেই, বাড়ী ফেরার পথে ঠিকই মনে হয়েছিল, আমার আর কবি হওয়া হলো না।

অধ্যবসায়ের সূত্রে চতুর শব্দের মালা হয়ত গাঁথতে পারবো। কিন্তু ঐ অদ্ভুত আত্মভোলামন কোথায় পাবো? ঐ দুর্বল শিশুর মত বিশ্বাসসবল মন কোথায় পাবো? আমি তো কোনোদিনই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না: "তোমার আলো সব ভুলালো লো অসরী বালা!" সব ভুলতে পারা কি সহজ নাকি?

সাহিত্য জীবন দর্শন, সব অর্থেই। তাহলে আজ যখন আমাদের জীবন দেউলে, জীবনের সব মূল্যই যখন অর্থহীন হলো, তখন আজকের মানুষের কাছে করুণানিধানের কবিতার কি কোনো মূল্য আছে?

আজকের বাঙ্গালী ময়্যবিত্ত-জীবনের ওপর, ফলে, নিজের ওপরও, বিশ্বাস হারিয়ে পণ্যসমাজের চারপাশে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্চে। আজ তার স্থিরিরোধী মনে বিবেক বলে কিছু আছে কি? সে জানে না। তার কর্তব্য কী? সে সত্যিই জানে না। তার মনুষ্যত্ব আছে কি? ও কথাটাও কি অর্থহীন হয়ে আসেনি? পথহীন শতাব্দীর কানাগলির দেওয়ালে মানুষ শুধু দুটো কথাই কোনোমতে পড়তে পারে। একটা হলো "অবিশ্বাস", অন্যটা "মৃত্যু।" এই দু'য়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই কাটে আজকের জীবনের ক্ষণবসন্ত। তার ভ্রুকুটিকুটীল অভিশপ্ত আকাশের কোনো রঙে, কোনো সুরে আনন্দ নেই।

এই ভ্রুকুটিকুঞ্চিত জীবনের আকাশে করুণানিধানের কবিতা ডেকে আনে বহুদিন আগে হারানো অবিশ্বাস্য প্রীতিকামনায় হাসিমুখ আর একটা আকাশ, মুঠোমুঠো শিউলি আর শিশির-ভেজা ঘাসের নিশ্চিন্ত আশ্বাস। হারানো বিশ্বাস ফিরে আসতে চায়। সহজ জীবনস্বপ্ন কথা কইতে চায়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মননের যে রেনেসাঁ, তার মেরুদণ্ড যদি রামমোহন-বিবেকানন্দ-বিদ্যাসাগর হন, মস্তিষ্ক যদি বঙ্কিম-সুরেন্দ্রনাথ হন, বাহু যদি মধু হেম রঙ্গলাল হন, রবীন্দ্রনাথ যদি তাতে প্রাণসঞ্চার করে থাকেন, তো বিহারীলাল-করুণানিধান সেই ভাবদেহের হৃদয়। আমার মনে হয় বিহারীলাল-করুণানিধানকে না জানলে উনিশ শতকের বাংলার হৃদয়কে জানা সম্পূর্ণ হয় না।

মৃত্যুর মুহূর্তে জীবনের আলোয় এক নিঃসঙ্গ কবি

তৃপ্তি রায়

জীবনের অতি প্রত্যুষে, একেবারে শৈশব কালেই করুণানিধানের কবিতার সংগে পরিচয় হয়েছিল; কবির সংগে পরিচয় হয়েছিল অনেক পরে।

তাঁর 'বর্ষার' কবিতা পড়ে শিশু মন কোন এক রূপের জগতে সঙ্গীতের জগতে হারিয়ে যেত।

কাঁঠালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস।
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই;
চলে গেছে চিল, গগনের নীল গ'লে গেছে জলধারে।

রবীন্দ্রনাথের 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে' যেমন মনকে ব্যাকুল করে তুলত করুণানিধানের এই কবিতাও মনকে তেমনি কোন এক অজানা রসে আপ্লুত করে দিত।

তাঁর 'বাসনা' কবিতা পড়ে যেন নিজের মনের বাসনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতাম

'ছুটব আমি সরল প্রাণে পর্ণ-কুটীর হতে
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলিপথে।'

* * *

অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে দেখব দুপুর-বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ আলোয় পাখীর সাঁতার-খেলা;
কাঠ ঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি করছে গভীর পাখায় রঙের মেলা।

তখনই কবির সংগে পরিচয় হয়েছে মনে মনে, কবির প্রতি এক অদৃশ্য প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করেছি। যত বড় হয়েছি,

কাবর সংগে কাবতার মাধ্যমে পারচয় আরও নাবড় হয়েছে।

প্রত্যক্ষ পরিচয় না ঘটলেও কবিকে দুর থেকে দেখেছি অনেকদিন। তাঁর গৃহ-সংলগ্ন সামনের রোয়াকে বসে থাকতেন। শ্বেতশুভ্র দাড়িগোঁফে কেমন যেন ঋষি ঋষি মনে হত। চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য স্বপ্নময়, শিল্পী ছাড়া ওরকম চোখ আর কারোর হতে পারেনা।

খুব ইচ্ছা করত কবির সংগে পরিচিত হতে কিন্তু সাহসে কুলাতোনা। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস, সেবার বি এ. পরীক্ষা দেবো। হঠাৎ কি খেয়াল হলো এক সহপাঠী বন্ধুর (সে আবার কবির আত্মীয়) সংগে চলে গেলাম কবির কাছে।

কবি কি খুশি একেবারে ছোট শিশুর মত। বললেন-'বড় একা, কেউতো আসেনা, তুমি এসেছো খুব ভাল লাগছে।

তারপর অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে বাল্যকালের কত কথা বললেন, বললেন রবীন্দ্র সান্নিধ্যের কথা। আমি প্রশ্ন করলাম, এখন কিছু লেখেননা কেন?

উত্তরে বললেন "কি করে লিখবো বল? চোখে তো ভাল দেখতে পাইনা। আমি বলে যেতাম আর অন্য কেউ যদি লিখে নিত, তাহলে খুব ভাল হতো।"

বললাম, 'আপনার ঐ কাজের ভারটা আমি নিতে চাই।'

খুব খুশি হয়ে বললেন—"তাহলেতো খুব ভাল হয়, তুমি কবে থেকে আসছ?"

আমি বললাম "মার্চ্চে আমার ফাইন্যাল পরীক্ষা তারপর থেকে রোজ আসব আমি।"

তাঁকে প্রণাম করে বাড়ী ফেরলাম কবির নিঃসঙ্গতার বেদনা তাঁর অসহায়তার যন্ত্রণা মনটাকে কেমন বিষন্ন করে তুলেছিল।

আমি কিন্তু আমার সত্যরক্ষা করতে পারিনি। মার্চ্চের আগে ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই স্বপ্নলোকের কবি চলে গেলেন অমরাবতীর অমর লোকে।

তাঁর একদিনের স্মৃতি সান্নিধ্যের সুধা সৌরভ আমার জীবনে চিরদিনের পাথেয় হয়ে রইল।

কবি করুণানিধান প্রসঙ্গে

বিনায়ক সান্যাল

[রচনাটি সম্প্রতি প্রয়াত মনস্বী অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সমালোচক বিনায়ক সান্যালের সর্বশেষ সমালোচনা মূলক নিবন্ধ। তদীয় পুত্র শ্রীমান তপোব্রত সান্যাল আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে রচনাটি পাঠিয়েছেন বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই

—সম্পাদক।]

কবির সঙ্গে পরিচয় আমার ছাত্রজীবনের শেষের দিকে। আমার ছাত্রজীবনে লেখা বেশ কয়েকটি গীতিকবিতা তিনি নিজে নির্বাচন করে আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন এবং পরে আমার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "রূপরেখা"য় তাঁরই নির্বাচিত কবিতাগুলিকে আমি অন্তর্ভুক্ত করি। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ গাঢ় হ'তে থাকে। প্রতি বছর পুজোর সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত। সেই সময় তাঁকে ঘিরে শান্তিপুরে সুধীজনের আড্ডা বসে যেত। তা'তে আমার পিতৃদেব আচার্য নলিনীমোহন, হরিশচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ সুধীজনেরা উপস্থিত থাকতেন। সেই সময়ে ও পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে আমি বহু ভাবে উপকৃত হয়েছি। তিনি যে নানা বিষয়ে নিষ্ণাত বিদগ্ধ কাব্য রসিক ছিলেন, একথা বোধহয় আজ অনেকেরই জানা নেই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত "শনিবারের চিঠি"তে কোন সময়ে কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর লেখা বিস্তৃত ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখতে আমি আগ্রহী পাঠককে অনুরোধ জানাই।

এবার করুণানিধানের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলি। বাগর্থের অপূর্ব সৌষম্যই হ'লো তাঁর কাব্যের শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস। অর্থ ছাড়াও শব্দের যে স্বতন্ত্র ধ্বনি সৌন্দর্য আছে—যাকে বলা যেতে পারে শব্দের উদ্ভাস, করুণানিধানের

কবিতায় কবিতায় ঘটেছে তাঁর অখণ্ডলাল প্রকাশ। চোখে তাঁর স্বপ্ন-অঞ্জন আর হাতে ধ্বনি-ধন্য ছন্দের ইন্দ্রজাল। শুধু শব্দ কেন, প্রতিটি অক্ষরের স্ফোট সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। শাব্দী ব্যঞ্জনার যে যাদু কবি রচনা করে গিয়েছেন, তা এক কথায় অনন্য ও অ-পূর্ব। ভরত যাকে বর্ণালংকার সমৃদ্ধি বলেছেন যার অন্য নাম রঞ্জনা-কাব্যের পূর্ণ পরিবহনের দিক থেকে তা'র মূল্য অল্প নয়! রঞ্জনা ছাড়া ব্যঞ্জনা অসম্ভব আর ব্যঞ্জনাই তো কাব্যের প্রাণ। এই বাক্ পরিমিতি, উদাম উচ্ছ্বাসের মুখে আবেগকে সংযত করার এই ক্ষমতা, "ক্লাসিস ঠাটে রোমান্টিক কল্পনার এই প্রকাশ" (মোহিতলাল) কবির রচনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে।

হাল আমলের জীবন বোধ করুণানিধানের কাব্যে নেই। আধুনিক সাহিত্যে জীবনের অব্যবহিত সমস্যা ও তার প্রত্যক্ষ স্থূল রূপটিই প্রধান উপজীব্য। এই সব সমস্যা ও তার সমাধানের মাধ্যম হিসেবে কাব্যের প্রয়োজন কতটুকু সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। ইন্দ্রিয় জীবনই তো মানুষের সর্বস্ব নয়; স্বপ্ন-পিপাসাও মানুষের জন্মসিদ্ধি। ইন্দ্রিয় জীবনের বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যা আর যাই হোক, কাব্য নয়। ব্যক্তকে অতিব্যক্ত করা কাব্যের ধর্ম নয়, অব্যক্তকে অভিব্যক্ত করাই তার মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। "নির্মাণ নয়, নির্মিতি; প্রতিবিম্বন নয়, উন্মোচন ও উজ্জীবন।" অন্তরের সেই নিভৃত আনন্দলোক কবির কাব্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জীবনের প্রতি অনীহা এর হেতু নয়, তাঁর মানসপ্রকৃতির বিশিষ্টতাই এর কারণ। রসোল্লাসে উচ্ছল, রঙে রেখায় উজ্জ্বল, কারুকর্মের বিলসানে বিশিষ্ট ও বিরল তাঁর কাব্য। রূপ থেকে ভাবে, ভাব থেকে রূপে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। শব্দার্থকে ঘিরিয়া অর্থাতিগ উপছায়া (penumbra) এর নব বাতাবরণ সৃজন ক'রে তাঁর কাব্যকে এক অনির্ণেয় লাবণ্য দান করেছে।

'রোমানটিসিজ্‌ম্', করুণানিধানের কাব্যের আর একটি দিক। এই লক্ষণটিকে কবির কথায় "সুদূর বিধুরতা" বলতে

পাওয়া। যা-আছে তাকে ফেলে তাঁর কল্পনা যা নেই তাঁর পেছনেই ঘুরে ঘুরে ফেরে মোহাবিষ্টের মতো। অতীত তার সমস্ত মায়ামাধুরী নিয়ে তাঁর মনোলোকে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। নিকটকে আড়াল ক'রে দূরের কস্তুরী সুগন্ধটিকে ঘ্রাণ-সীমায় ঘনিয়ে আনা রোমান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। আবেগের তীব্রতার চিহ্ন, ভাষার মধ্যে কিন্তু অলক্ষ্য। ছন্দোলয়ে উল্লাস আছে, উদ্বেলতা নেই। এদিক দিয়ে ইংরেজ কবি রসেটির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা স্বতই মনে আসে।

কবির তীর্থ কবিতাগুলিতে তাঁর আত্মদর্শনের পরিচয় পরিস্ফুট। দর্শনের জ্ঞান ও জ্ঞানের দর্শন এই কবিতাগুলিতে এমন ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে, জীবন জিজ্ঞাসা এমন অপূর্ব কবিত্বময়ী স্ফূর্তি লাভ করেছে, যে দার্শনিকতার অবলেপ তাদের কাব্যদ্যুতিকে ম্লান করতে পারে নি। ভাব এখানে অনুভূতি হয়ে রসরূপে পরিণত হয়েছে।

আমি বৃদ্ধ, অশক্ত ও অসুস্থ। এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা থেকে তা'ই এখানেই আমাকে নিবৃত্ত হতে হচ্ছে। আমি আশা করব, রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ এই কবির কাব্য সম্বন্ধে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা তাঁকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

[কবি করুণানিধান/ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭ পৃষ্ঠার পর]

অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিয়াছেন। শেষ দিকে পুণ্যশ্লোক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় করুণাদাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে করনীকের চাকরী দিয়াছিলেন।

চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কবি যখন শান্তিপুরের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন তখন একবার কয়েকজন বন্ধু লইয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছিলাম।

যৌবনে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় সারা জীবনই দুঃখের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। নিজে সারা জীবন দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে এক অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন।

কবি করুণানিধান

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নদীয়া শান্তিপুরবাসী সুকবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবছর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। আগেই খবর পাইয়াছিলাম করুণানিধানের গুণমুগ্ধ ভক্তগণ শান্তিপুরে তাঁহার একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। কবির পক্ষে ইহা একটা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

সৈকত সম্পাদক শ্রীমান মাধব ভট্টাচার্য কবির কথা বড় করিয়া ও ভাল করিয়া প্রচার করুন, তবে তিনি শুধু করুণানিধানের আশীর্বাদ লাভ করিবেন না বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজের আশীর্বাদ ভাজন হইবেন।

করুণানিধানের কবি প্রতিভার পরিচয় দিবার ক্ষমতা আমার নাই। সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার ১০০টি কবিতা শতনরী নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। করুণানিধান প্রথম জীবন হইতেই কবিতা রচনা করিতেন।

১৯৩০ সালে রামধন মিত্র লেনে (শ্যামবাজার) যে ভাড়া বাড়ীতে কবি বাস করিতেন সে বাড়ীতে আমারও ৪ মাস বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেখানে কবিকে খুব কাছাকাছি নিবিড় ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সর্বদা তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং তা' উচ্চশ্রেণীরই হইত। তাঁহার রচিত কবিতা আমার সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' কাগজে ছাপিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

মানুষ করুণানিধান অত্যন্ত সহৃদয় ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। একবার আমার অগ্রজ পিতৃতুল্য মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হইয়া বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হইলে করুণাদা প্রতিদিন একবার করিয়া আমার বাসগৃহে আসিয়া দাদার খবর লইয়া যাইতেন।

২৬ পৃষ্ঠায়

কবি করুণানিধান

ধীরানন্দ রায়

প্রতিটি উপস্থিত মুহূর্তই তো লক্ষ কোটি বর্ষের সাধ্য-সাধনার সৃষ্টি সম্ভব! অন্য দিকে এই মুহূর্তটিই আবার অনাগত সংখ্যাবিহীন ক্ষণগুলির জন্মিতা।

কাল চংক্রমনে বিশেষ ক্ষণগুলির দিক-চিহ্ন হারিয়ে গেলেও,-একমাত্র মানুষই, এই কালের দেহে তার বিশেষ গোত্র পরিচয় এঁকে দিয়ে বলে—"সেটা ছিল কালিদাসের কাল"..... ওটা রবীন্দ্র যুগ।....."

আমরাও কেন তাই বলিনা,—"উনিশশো সাতাত্তোর-এই বছরটা আর এক কবির নামে চিহ্নিত!"—১৯৭৭-কবি করুণানিধান জন্ম শতবর্ষ!

অতীতের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলিকে, বর্ত্তমানের গোলায় তুলে আনাই তো মানুষের সংস্কৃতি। আর এই রিক্থ রক্ষতাই তার গোটা অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তাই আগত দিনের উদ্বোধনে, বিগত কালের স্মৃতির প্রদীপ জ্বালা, কোনো ব্যর্থ প্রয়াস নয়।

করুণানিধান আমাদের সাম্প্রতিক অতীতের, কেবল অন্যতমই নন, বিশিষ্টতম রিক্থ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্যে একটি পালার কথা উল্লেখ করেছিলেন; সে পালা "সীমার মধ্যেই, অসীমের সংগে মিলন সাধনের পালা।"

ওমনি ভাবে, প্রত্যক্ষ কাব্য পরিচিতি না দিলেও করুণা-নিধানের কাব্যে একটি মাত্রই পালা আছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে "বর্তমানের মধ্যেই অতীত পুনরুজ্জীবনের পালা।"

বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র প্রভাবিত রোমান্টিক যুগের শেষ কবি সম্ভবত করুণানিধানই, কিন্তু বাংলা কাব্যে যিনি রোমান্টিকতার পত্তন করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ নন, বিহারী-লাল। আর করুণানিধানই যে বিহারীলালের সর্বোত্তর সাধক,

এ কথাটি প্রায় সকলেই ভুলে বসে আছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, বিহারীলালের রোচিষ্ণুতার দানটি কবি করুণানিধান, রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যের অঞ্জলি হতেই লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা, প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও, কবি করুণানিধানের ভাব ভাবনার রূপ-রেখার মিল যতটা বিহারীলালের সঙ্গে ততটা তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে নয়।

বিহারীলালের মৃত্যুর পর, তাঁর ব্যক্তি জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে কোন সমালোচক বলেন - "বিহারীলালের মনে যেমন যশের আকাঙ্ক্ষা ছিলনা তেমনি অখ্যাতির আকাঙ্ক্ষাও ছিলনা - " কথা কটি করুণানিধানের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কেও যে প্রযোজ্য তাঁর সঙ্গে পরিচিত যাঁরাই ছিলেন, একথা তাঁরাই জানেন। এই পরিচয় তাঁর "সমর্পণ কবিতাতেও স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

ওরে মান কুড়াইয়া কি হবে ?
যা আছেরে তোর পথে প্রান্তরে
দান কর তুই নীরবে ;
আর মান কুড়াইয়া কি হবে ?
দে রে দে রে লাজ ভাসায়ে,
সাজ আজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।

বিহারীলালের সঙ্গে কবির আরও কয়েকটি সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষণের কথা এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিহারীলালের স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮-৫৯) ২৪ বৎসর বয়সে প্রকাশিত এক নিবন্ধ কাব্য, এতে তাঁর স্বাদেশিকতার স্বাক্ষর রয়েছে। ঠিক ২৪ বৎসর বয়সেই কবি করুণানিধানের "বঙ্গমঙ্গল" (১৯০১) প্রকাশিত হয়। আর এই কাব্যগ্রন্থে, কবি, স্বাদেশিকতাকেই মূল ভাবরূপে অবলম্বন করেছেন।

করুণানিধানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বঙ্গমঙ্গল" নামকরণের দিক থেকে বিহারীলালের কাব্যগ্রন্থ "বঙ্গসুন্দরী" আর "সারদা মঙ্গল" এই দুটি নামের প্রথমার প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার

পরাক্ষের যে যোগ ঘটিয়েছেন একথা অবশ্য অর্ব্বাচীনেই বলবে, কিন্তু বিহারীলালের মহাপ্রয়াণে, কবি শিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল যে শোকগাথা রচনা করেন তাতে তাঁর শোক প্রকাশিত হলেও কাব্যাদর্শগামীত্ব ততখানি প্রমাণিত হয়নি, যতখানি হয়েছে বিহারীলালের উদ্দেশ্যে লেখা করুণানিধানের 'প্রবেশ' কবিতাটিতে

আজকে অতিথি তোমার ভুবনে
তোমার সোনার খনিতে,
এইখানে পাবচির বাঞ্ছিত
জীবনের জ্যোতিঃ পুলকাঞ্চিত
হেথায় শুনিব সোহাগ রাগিণী
হৃদয় শোণিত ধ্বনিতে,
এসেছে সেবক নবনিবেদক কবিবর
কলকোলাহল ঘৃণিয়া
দাঁড়ায়েছি এসে বালির ডাঙায়
অস্ত রবির রঙিন রাঙায়
মনের মতন মিলেছে হেথায়
ছায়াপথে পথ চিনিয়া।"

করুণানিধান "পুলকাঞ্চিত জীবন জ্যোতিঃ' যে বিহারীলালেই খুঁজে পেয়েছেন তা নিছক কাব্য কথা নয়, ও তাঁর মর্ম্মকথা, তা না হলে, বিহারীলালের "সুরবালার" অনাহত ধ্বনিটুকু করুণানিধানের "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি" কবিতায় এমন ভাবে শোনা যেতনা, বিহারীলাল লিখেছেন—

"তুমিই সুরবালা সে সুর রমণী
উষারাণী হৃদি উদয়াচলে
সখা শক্তিশেল বিশল্যকরনী
মৃতসঞ্জীবনী ধরণীতলে।"

আর করুণানিধান লিখেছেন :—

"তোমার আলো সব ভুলালো,
লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা,"

আর একটি ব্যাপারে করুণানিধানের সঙ্গে বিহারীলালের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট করুণানিধান, বিহারীলালের মতই "চোখের জলের মধ্যে আনন্দের স্বাদ খুঁজে পেয়েছেন" দুজন কবির যে কোনো দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলেই এটা আর বলে বোঝানোর প্রয়োজন হবেনা, আপনা থেকেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে যাবে। প্রথমে বিহারীলালেরই কয়েক কলি তুলে ধরছি :—

"সর্ব্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ কি অনন্ত জ্বালা"
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন। (উপহার)

এবার করুণানিধানের :—

"পী কাঁহা, সে গোরী কাঁহা ?
প্রতিধ্বনি কাঁদে আহা,
কই সখি কই ?
হারে মুসাফিক পাখী,
কে আর মুছাবে আঁখি
দরদিয়া বই !
পূর্ণশশী করে খাঁ খাঁ
নিথর নিশুতি ঢাকা
স্তিমিত আঁধারে,
রাতের বাতাস কার
ফুকারিছে হাহাকার
দরিয়ার পারে" (পাপিয়ার প্রতি)

বিহারীলালের আর একটি কবিতার কয়েক কলি :—

"অয়ি অয়ি সখী জগতের জ্বালা
জ্বালায়ে আমায় করেছে খুন
যুগে যুগে মাঝে হইয়াছি আলা
চারিদিকে ঘেরা বেড়া আগুন।" (প্রিয়সখী)

করুণানিধানের ঃ

তুমিও কি আজি আমারি মতন এমনি উতলা অথর চিতে,
বক্ষে চাপিয়া আগুনের ঝাঁপি ফুঁপিয়া উঠিছ আচম্বিতে ?
জাগরণে নেই ! হেরি স্বপনেই আনাগোনা কত লজ্জাবতি,
একি তব রীত ! আমার সহিত একি লুকোচুরি ব্যথার ব্যথী ?

এমনি ভাবেই বহু উদ্ধৃতিই উদ্ধার করা যাবে যাতে আমরা দেখতে পাব যে, দুজন কবিই ব্যথার তন্ত্রীতে মীড় টেনে রসধ্বনি জাগিয়েছেন।

রোচিষ্ণু কবির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আত্মকেন্দ্রিক ভাবনিমগ্নতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম,—কিন্তু করুণানিধান যে রোমান্টিক কবি, রোচিষ্ণুতাই যে তাঁর পরতে পরতে আবেশ বিহ্বলতা জাগিয়ে রেখেছে —'এ সম্বন্ধে কোনো বিরাট রকমের মত বিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই।

কবির 'শতনরী'র সর্বশেষ সংস্করণের ভূমিকায় কালিদাস রায়, কবিকে "স্বপ্নদৃষ্টির একমাত্র কবি" বলে উল্লেখ করেছিলেন—এমন কথা বলা বাহুল্য বলেই আমার মনে হয়, কারণ স্বপ্ন দেখা তো রোমান্টিক আর্টের প্রথম কথা। জগতের প্রতিটি রোচিষ্ণু কবিই স্বপ্ন দেখেছেন (অবশ্য নিদ্রায় নয় জাগরণে)।—কেউবা দেখেছেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন যেমন শেলী, কেউবা অতীতের যেমন কীটস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কেউবা অতীত, ভবিষ্যৎ দুটোরই, যেমন রবীন্দ্রনাথ। রোমান্টিক কবি হিসারে করুণানিধান উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তিনি অতীত ভিক্ষু। তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই "হারানো দিনগুলি" বেদনার রসে উজ্জীবিত, এ পরিচয় কবি নিজেই তাঁর "অতীত" কবিতাটিতে ব্যক্ত করেছেন। আর ঐ কবিতাটিরই মূল সুর নানান ভাষায় ছন্দে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর হাজার কলিতে-কবি লিখেছেন

"নাই সে সরল কিশোর বয়স
সাঙ্গ সুখের খেলা,"

এই হারানোর সঙ্গে কি সুতীব্র বেদনারই না অনুরণন :

"কুমার হারা ভবন সম

বিষণ্ণ এই হৃদে
আজকে কাদের অদর্শনে
কাঁটার মতো বিঁধে।"

কবির প্রেম-কবিতা ও নিসর্গ কবিতা থেকে গোটা কয়েক উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাক।

প্রেম কবিতা :

"মনের কানে কাঁপতেছিল বিস্মৃত পর্দ্দায়
হাজার বছর আগের সজা বাঁশির সুরের ঢেউ,
বঁধুর মনে মিলত গলা মধুর বেদনায়,
হাজার বছর আগের এক বসন্ত সন্ধ্যায়

(রবীন্দ্রনাথের অনন্ত-প্রেম এক্ষেত্রে তুলনীয়) নিসর্গ বর্ণনায় :

চন্দ্রকিরণ লুকায় এখন গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস আথিবিথি খোঁজে তাকে
মুক্ত চিকুর ভারে কুঞ্চিত জলধারে
অঞ্চল তা'র ঝাপায়ে পড়েছে নীল তটিনীর বাঁকে।

তারপরই :

"সুখের কুঞ্জ ভাঙিয়া গিয়াছে
শূন্য সাজান ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মাণিক
জ্যোৎস্না ডোবার পর—"

অতীত লিপ্সু কবি-মন বেদনার নুড়িপথ দিয়েই কাব্যের বর্ষাধারাকে নামিয়ে এনেছেন, এর প্রমাণ উপযুক্ত উদ্ধৃতি দুটোতেই যে কেবল আছে এমন নয় কবির কবিতার প্রতিটি ছত্রেই তা অভিব্যঞ্জিত। একথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। পুনরুক্তি করা যাক, করুণানিধান রোমান্টিক কবি, "অতীতের প্রতি তৃষ্ণা তাঁর অপরিসীম চোখের জলের রচা আনন্দ সাগর তাঁর বুকে উথলে ওঠে'—এ-কটি কথা মনে না রাখলে, তাঁর কবি মানসের দ্বারোদ্ঘাটন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, তাঁর প্রতিভা নির্ণয়ে ত্রুটি থেকে যাবে।

একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বলেই ১৩৪৫ সালে তাঁরই সম্পাদিত "বাংলা কাব্য-পরিচয়" এ করুণানিধানের "তোমার প্রতি" আর "আবছায়া" এই দুটি কবিতাকেই তাঁর হাজার কবিতার মধ্য থেকে নির্ব্বাচিত করেছিলেন, কবিতা দুটির প্রতি শব্দ ঝংকারেই যেন কবি মানসের অতীতানুরঞ্জিত বেদনা, মূর্চ্ছাতুর আবেশ স্পন্দিত।

"মনের কথা রইল মনে বন্ধু মোর,
নয়ন কোণেই রইল জমে নয়ন লোর।" (ব্যথা)

আজকে পিছে চাইগো মিছে, নেই সেদিন,
শুনতে যখন অনেক কথা অর্থহীন,
আজ বাঁশিতে বেসুর বাজে আচমকা,
সত্যি হল স্বপ্নে দেখা আশঙ্কা।" (অতীত মিশ্রিত ব্যথা)

প্রত্যেক কবিরই একটি করে নিজস্ব ধারা ও আদর্শ থাকে যাকে অবলম্বন করে কবি মন ও কাব্য যুগপৎ অভিব্যক্তি ও ও বিকশিত হয়ে ওঠে, আর সেই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি মনের প্রাথমিক উপলব্ধির ধারা ও আদর্শের গুণগত পরিবর্তন বা রূপান্তর সাধিত হয়, করুণানিধানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিভাবে তা হয়েছে এবারে সেটাই বলবো।

প্রথম যৌবনে কবির মনে দেশ প্রেমের ঢল নেমেছিল, বিদেশী শাসকের অত্যাচারে সাড়া দেশটা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল. করুণানিধানের কবি মানসে, ব্যথার সেতারে তখনই অতীত রাগিণীর সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, আর তারই ফল তাঁর "বঙ্গমঙ্গল কাব্য"। কবির দেশপ্রেম শুধু তাঁর কলা লোকের ক্ষেত্রেই বিচরণ করেনি, তাঁর কর্ম জীবনকেও করেছিল নিয়ন্ত্রিত। তিনি তাই সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উনিশ আর বিশ এই দুটো শতকের মেশামিশির কালটার জাতীয় আন্দোলন, কেবল করুণানিধান বলে নয়, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মানস পরিমণ্ডলকে কোন না কোন ভাবে রূপদান করেছিল। আবার সেই আন্দোলনের জয় পরাজয়ের ওপর প্রতিটি দেশবাসীরই মানস স্বরূপের বিশেষ গঠন ও নির্ভর করেছিল।

হয়েছিল এবং তারই ফলে সে যুগের জাতীয় মানস গিয়েছিল খানিকটা এঁকে বেঁকে, আর ভেঙেচুরে।

সাধারণ মানুষের মনোভাবের রূপরেখার পরিচয় ফুটে তার আচার আচরণে আর কবি মানসের পরিচয় ফুটে বেরোয় তাঁর কাব্যে। জাতীয় আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর করুণানিধানের মানস নীহারিকায় যে কোন গ্রহ জন্ম নিয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর "প্রসাদী" কাব্যগ্রন্থে, এই কাব্যগ্রন্থেই অতি স্পষ্টভাবে কবিকে অতীত ভিক্ষু হতে দেখি। কারণ মানুষ সামনে চলার পথ না পেলে পেছু হটতে থাকে, যেহেতু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটাই জীবনের পরিপন্থী। বিদেশী শাসনে রাষ্ট্রযন্ত্র যখন বর্ত্তমানের দাবী আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন মুছে দিল, তখন মনের মজুরী মিললো অতীতের খনি থেকে হারানো মণি সংগ্রহ করায়। কবির এই অতীত লিপ্সার পেছনে জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা সাধারণভাবে কাজ করলেও এর ল আমাদের জীবনের আরও গভীর স্তরে লুক্কায়িত।

দেশিক আক্রমণ আমাদের ইতিহাসকে হাজার বছর ধরে রবার লাঞ্ছিত করেছে এবং তার ফলে আমাদের চেতনা ধাপে পই অতীত-উন্মুখী হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ পর্ব্বে, আধুনিক লের ভারতের মাটীতে ইংরেজের কায়েমী শাসন, ভারতের তীত কালের সমাজ বিন্যাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলো অথচ কল্যাণকর নতুন কোন বর্তমানের অঙ্গীকার এনে দিলনা বলে হতাশাবাদ মেশানো এক "অতীতাগ্রহকুট" জন্ম নিলো। আর এরই চিহ্ন রয়ে গেছে আধুনিক বাংলা কবিতায়। ধুসূদন থেকে শুরু করে করুণানিধান পর্য্যন্ত প্রতিটি কবিই তীত এষনার সূতো দিয়েই, কাব্যে কল্পনার মালা গেঁথেছেন।

কিন্তু তবু আধুনিক বাংলার কবিরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, কদল পুরানো কালের তুলি দিয়ে নোতুন কালের দৃশ্যই ফুটিয়ে

ব্যবহার করলেও ছবিটা এঁকেছেন পুরাতনেরই যেমন বিহারী লাল, অক্ষয় বড়াল। করুণানিধান এই পরের দলেরই কবি।

করুণানিধানের প্রতিভার যথার্থ মূল্য বিচারের সময় এখনো হয়তো আসেনি। অতি সান্নিধ্যের দরুণ হয়ত তাঁর কাব্যের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশ অতিরঞ্জিত হয়ে চোখে পড়বে, হয়তো বা কোন সবল অংশ অরঞ্জিত হয়ে দৃষ্টির বাইরে পড়ে থাকবে কিন্তু কবি যে বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণের পতাকা দ্বিধাহীন ভাবে বহন করেছেন—এটি কোন সহৃদয়েরই নজর এড়াবেনা।

করুণানিধানের কবি মানসের বিবর্ত্তন ঘটেছে একথা অসত্য নয়; কিন্তু কখনই তাঁর কবি ধর্মচ্যুত ঘটেনি।

"গীতার" অনুবাদ তিনি সবে শুরু করেছেন এমন সময়ে কোন একজন বন্ধু আমাকে বলেন,' 'করুণানিধান কবি ধর্মচ্যুত হয়ে এবারে আধ্যাত্মিকতাকেই আশ্রয় করলেন।

কবির "গীতারঞ্জন" না হোক তাঁর "সর্ব্বেশ্বর" পড়লে, সাধারণ ভাবে আমাদের সেই কঠোর সমালোচকের কথাটাই সত্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু সত্যিই তা সত্যি কিনা তা আজও বিতর্কের বিষয়। অধ্যাত্মবাদ করুণানিধানের কবি ধর্ম্মকে মাঝে মাঝে মেঘাবৃত করেছে, কিন্তু গ্রাস করতে পারেনি, অবশ্য কিছুদিন নেতিবাদী মরমিতা যা বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা থেকে জন্ম নেয়, তা কবিকে সম্মোহিত করেছিল। এই নেতীবাদী মরমিতার এক সুগভীর চিহ্ন রয়েছে ১৩৪৫ সালে লেখা তাঁ "শেষ লিপি"তে—

সে লিপি হয়েছে হারা, অনুদিন
বাঁকা লেখা তার
অস্ফুট হইয়া আসে স্মৃতির সে
তুলোট কাগজে
অশ্রুতে ধুয়েছে মসী, আজও তবু
কেন তার খোঁজে

বারবার ?
ক্ষয়ে গেছে রেখাকার কে চিনিবে
পুরানো বানান ?
ভুলে ভরা ব্যাকরণ, আছে ছত্র নাহি
তার প্রাণ।
সে লিপির সাদা পিঠে
দেখি উল্টা হরফের রূপ,
বুঝি গো আরেক অর্থ
অগ্নিতাপে ফুটে কালোছাপ,
মিলন-গোলাপ গন্ধে বিচ্ছেদের
কাঁটার প্রলাপ,
তিক্ত লাগে বিলাসের ইস্তাম্বুল
গুগ্‌ গুলের ধূপ।
মৃত্যুই বাঁচিয়া থাকে—
মরে যাহা মৃত্যুজিৎ,
কাল সে কটাক্ষ হানে
টুটে তাজমহলের ভিৎ,"

নতিবাদী মরমিতার আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি যেন
ত্য সম্বন্ধে একটু বেশী সজাগ হয়ে ওঠেন, তাঁর "গীতাঞ্জন"
ই সচেতনারই ফল, কবি স্পষ্টই বলেছেন—

"জীবন মৃত্যু সংগ্রামে একা বাই তরণী
সাগর হইয়া গিয়াছে সমুখে বৈতরণী।"

কিন্তু তখন ও তাঁর অতীত লিপ্সা কাটেনি :—

"কতনা অতীত চিতায় পুড়িয়া
চিহ্নহারা
পরপারে কারা মৌন ভাষায়
দেয় গো সাড়া ;
রুদ্র ডঙ্কা বাজে দিক ভরি
বধির ছবিরা উঠিল মুখরি
যেথা বন্ধন সেথা ক্রন্দন
অন্ধকারা"

"ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা প্রণমে মন," (উত্তরণ)

এই উত্তরয়ণের পরই কবি বৈষ্ণবীয় মরমিতার এক নতুন দীক্ষা গ্রহণ করলেন তাঁর অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "সর্বেশ্বর" এ—

"বেরিয়েছে আজ গেরুয়া বাস
পরেছে তার মন,
দাওগো সাড়া প্রাণের ঠাকুর
দাও গো দরশন।"

শেষের দিকে করুণানিধান কেমন যেন পরস্পর বিরোধী চিন্তার আঘাতে জর্জরিত ও অধিকতর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অধ্যাত্মবাদ আর শিল্প চেতনা তাঁর অনুভূতিকে দুদিক থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল। অনন্ত জীবন আর অনন্ত মৃত্যুর মাঝে যে বন্ধনের রেখাটি কবি যেন খুঁজে পাই পাই করেও পাচ্ছিলেন না। আর তার ফলে শিষ্যত্বের দাবী পুরোপুরি বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের কবি মানস যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল, করুণানিধান ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে এসেই উপনীত হয়েছেন শেষ জীবনে। রবীন্দ্রনাথ এই বলে সুরু করেছিলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" আর করুণানিধান কি বলে শেষ করেছেন তা'তো বলেছি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এই জীবন-অস্বীকৃতি হয়তো কবিকে নোতুন এক সমন্বয় চেতনার তীরে পৌঁছে দিতো; কিন্তু কালের প্রহরী জীবন নাট্যের শেষ অঙ্কের মানস বিবর্তনের ইঙ্গিতটুকু মাত্র দিয়েই যবনিকা টেনে দিল।